জনপ্রিয়তা
বিদ্যুৎ মিত্র

জনপ্রিয়তা

বিদ্যুৎ মিত্র

প্রজাপতি প্রকাশন

অনুজপ্রতিম,
সুযোগ্য সহকর্মী
এম এ কুদ্দুসকে
—বড়দা।

সূচি:

কোথায় পাবো তারে

জনপ্রিয়তা ও সুখ-সমৃদ্ধি কমবেশি সবাই আমরা চাই।
কিন্তু কোথায় পাওয়া যায় এগুলো?
জানি না।

আমরা জানি, এসব অর্জন এককভাবে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার উপর নির্ভর করে না, কঠোর পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে না, একাগ্রতা বা ধৈর্যের উপর নির্ভর করে না, আনুগত্যের উপর নির্ভর করে না, অভিজ্ঞতার উপরও নির্ভর করে না। নিজের ঢাক নিজে পিটালেও লাভ তো হয়ই না বরং ক্ষতি হয়, বন্ধু-বান্ধব, সমাজ বর্জন করে সেই ঢাকীকে।

তাহলে কিসের উপর নির্ভর করে এসব?

মানুষের উপর। মানুষের সাথে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর। ভাল করে ভেবে দেখেছি: আমার সুখ, আমার সমৃদ্ধি, আমার জনপ্রিয়তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে অপর মানুষের উপর। অপরের হাত থেকে নিতে হবে সবাইকে এই জিনিস। জঙ্গলে গিয়ে আপনি এগুলোর কোনটাই পাবেন না। মানুষের কাছ থেকেই পেতে হবে আপনাকে এসব।

যেকোন কিছু তিন ভাবে পেতে পারেন আপনি: (ক) কেড়ে—অর্থাৎ, শারীরিক বল প্রয়োগ করে, ভয় দেখিয়ে, বা ঠকিয়ে; (খ) হাত পেতে—অর্থাৎ, ভিক্ষা করে, আমি আপনার কোন ক্ষতি করব না, আপনার সাথে কোন বিষয়ে কখনও প্রতিযোগিতায় নামব না, বিনিময়ে দয়া করে আমার উপর সদয় থাকবেন, এই রকম ভাব দেখিয়ে; আর, (গ) সমমর্যাদার ভিত্তিতে—অর্থাৎ, আমি কিছু দেব, বিনিময়ে আপনি কিছু দেবেন; আপনার যা প্রয়োজন সেটা আমি দেব, আমার যা প্রয়োজন সেটা আপনি দেবেন, এইভাবে।

প্রথম দুটো পন্থা উপেক্ষা করে আমরা এই শেষের পন্থা নিয়েই আলোচনা করব।

কেড়ে নেয়ার নীতিতে বিশ্বাসী হলে আমারটাও কেড়ে নেবে আমার চেয়ে শক্তিশালী কেউ। হাত পাতার নীতিতে বিশ্বাসী হতে পারি না, জানি, কেউ পছন্দ করে না ভিখারীকে—ভিখারী নিজেও না। কাজেই আমরা পারস্পরিক আদান-প্রদানের নীতিতে বিশ্বাস স্থাপন করব।

একটা মস্ত ভুল ধারণা রয়েছে আমাদের অনেকেরই মধ্যে। আমরা মনে করি, নিজের সুখ-সমৃদ্ধির জন্যে যদি আমার চাহিদা পূরণ করতে যাই তাহলে বুঝি স্বার্থপরতা হবে, অন্যকে অসন্তুষ্ট ও বঞ্চিত করতে হবে, তার চাহিদাটা আর পূরণ হবে না। অনেকে আছেন, এইজন্যে পিছিয়ে থাকেন, দমিয়ে রাখেন নিজেকে, এগুতে পারেন না দ্বিধায়।

আসলে কিন্তু আপনার নিজের প্রয়োজন মেটানোটা মোটেই স্বার্থপরতা নয়। অপর মানুষের কাছ থেকে কিছু নিলেই তাকে বঞ্চিত করা হয় না, যদি বিনিময়ে তাকে তার ন্যায্য পাওনা চুকিয়ে দেন। দেয়া-নেয়ার মাধ্যমেই সুস্থ সম্পর্ক গড়ে ওঠে মানুষের সাথে মানুষের। অন্যের চাহিদা পূরণ না করলে আপনার চাহিদা পূরণ হবে না। এই আলোচনার মাধ্যমে আপনাকে এমন এক বিদ্যার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হবে যেটা প্রয়োগ করে আপনার সব রকমের চাহিদা আপনি অনায়াসে আদায় করে নেবেন মানুষের কাছ থেকে। যার কাছ থেকে নিলেন সে সন্তুষ্ট-চিত্তে দেবে সেটা। তার কারণ, বিনিময়ে আপনিও তাকে এমন কিছু দিতে যাচ্ছেন, যার জন্যে কৃতজ্ঞ বোধ করবে সে আপনার প্রতি। তাকে সুখী করেই আপনি সুখী হতে যাচ্ছেন। এখানে পরাজয় বলে কিছু নেই—দু'জনেই ফার্স্ট। আমিও জয়ী, আপনিও জয়ী।

সে রকম কিছু কি সত্যিই আপনার আছে? মানে, দেয়ার মত কিছু?

স্বনামধন্য কয়েকজন মনোবিজ্ঞানীর উত্তর হচ্ছে: প্রচুর পরিমাণে আছে, অঢেল আছে। এতই পর্যাপ্ত পরিমাণে যে দুই হাতে বিলিয়েও শেষ করতে পারবেন না আপনি কোনদিন। যখনই আপনার এই বিশাল ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার সম্পর্কে সচেতন হবেন তখনি উপলব্ধি করতে পারবেন কী প্রচণ্ড আপনার ক্ষমতা। অকাতরে দান শুরু করবেন আপনি আপনার অফুরন্ত ঐশ্বর্য, পরিবর্তে মানুষ আপনাকে দেবে সুখ, সমৃদ্ধি, জনপ্রিয়তা—যা চান।

নিজের ঐশ্বর্য সম্পর্কে সচেতন হতে তো হবেই, সেই সাথে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে আপনার মানুষের সঠিক প্রকৃতি সম্পর্কে। যাদের নিয়ে আপনার কায়-কারবার, তাদের ঠিকমত চিনতে এবং বুঝতে পারলে সবকিছু আপনার কাছে হয়ে পড়বে জলবৎ তরলং। ওদের চিনতে গিয়ে জানা হয়ে যাবে আপনার নিজেকেও।

মানুষের কি হওয়া 'উচিত' সেটা এই আলোচনার বাইরে রাখব আমরা। আসলে মানুষ কি, তার উপর ভিত্তি করে এগোব সামনে। মানুষের প্রকৃতি চিনে নেয়া আপনার জন্যে অত্যন্ত জরুরী দরকার। সেটা চিনতে ও বুঝতে পারলেই মানবপ্রকৃতির বিরুদ্ধে না গিয়ে কিভাবে স্রোতের অনুকূলে তাকে কাজে লাগানো যায়, পরিষ্কার হয়ে যাবে আপনার কাছে। অজানার প্রতি সব মানুষেরই দ্বিধা ও ভয় থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু জানা হয়ে গেলে দক্ষতার সাথে, আত্মবিশ্বাসের সাথে এই জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করতে কোনই অসুবিধে হবে না আপনার।

এ বিষয়ের উপর বইয়ের অভাব নেই। বিদেশে প্রচুর লেখা হয়েছে এ নিয়ে। অসংখ্য বই বেরিয়েছে। সম্প্রতি এই জাতীয় অনেকগুলো বই ঘেঁটে দেখবার সুযোগ হয়েছিল আমার। কি দেখলাম? কিছু বই সত্যিই ভাল, কিন্তু বেশির ভাগ বইয়েই আসল ব্যাপারটা এড়িয়ে গিয়ে চমৎকার সব মন-ধাঁধানো গল্প ফাঁদা হয়েছে। মজার মজার গল্প বলেই পাঠককে অভিভূত করে ফেলবার প্রয়াস রয়েছে। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, ওসবে পাঠকের তেমন কোন উপকার হওয়ার কথা নয়। অমুক অবস্থায় অমুকে কি করেছিল সেটা আমার কাজে লাগতে পারে কেবল তখনই, যখন আমি

মানব-চরিত্র ও প্রকৃতি সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান অর্জন করেছি। অসংখ্য উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত মুখস্থ করে এবং সেসব অনুকরণ করে জ্যান্ত মানুষ চলতে পারে না। তার সমস্যা ব্যক্তিগতভাবে তারই—আরেকজনের ফর্মুলায় ফেলতে গেলেই আড়ষ্টতা এসে যাবে চলনে, বলনে, ব্যবহারে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ডেল কার্নেগী' বলে খেপাতে শুরু করবে বন্ধু-বান্ধব, আড়ালে আরও খারাপ কথা বলবে।

এই প্রসঙ্গে ছোট্ট একটা গল্পের কথা মনে পড়ছে। পুরোনো গল্প—হয়তো আপনার জানা; তবু বলছি আমার বক্তব্যটা আরও একটু পরিষ্কার ও জোরাল করবার খাতিরে।

নামজাদা এক কবিরাজের একই ছেলে। একেবারে গাধা। কবিরাজের বয়স হয়েছে, একদিন ছেলেকে ডেকে বললেন: আমি এই আছি, এই নেই। কবিরাজীটা শিখে নে। নইলে খাবি কি?—এই বলে ছেলেকে তিনি শিখিয়ে দিলেন ওষুধ তৈরির কৌশল। একটাই ওষুধ, তফাৎ শুধু বড়ির ছোটবড়তে।

ছেলে তো অবাক। বাবাকে শুধাল: এই একটাই? আর সব?

কবিরাজ মশায় বললেন: আর নেই। এই এক ওষুধেই সারবে খুঁজলি থেকে শুরু করে নিউমোনিয়া, টাইফয়েড পর্যন্ত সব রোগ।

ছেলে বলল: সে কি করে হয়?

কবিরাজ বললেন: ওরে গাধা, ওষুধে কি রোগ সারে? যিনি সারাবার তিনিই সারান।

ছেলে শুধাল: তাহলে তোমার কাজটা কি? তুমি কি চিকিৎসা করো?

কবিরাজ বললেন: সেইটেই শিখতে হবে তোকে। কাল থেকে বেরুবি আমার সাথে।

পরদিন থেকে ডাক পড়লেই বাপের সাথে ছেলেও যেতে শুরু করল বাড়ি বাড়ি। এক বাড়িতে ছোট এক ছেলের প্রবল পেট ব্যথা, কবিরাজের দেয়া ওষুধে কাজ হচ্ছে না, তাই ডাক পড়েছে আবার। পুত্রকে নিয়ে হাজির হলেন কবিরাজ মশায়। দশ মিনিট রোগীর নাড়ি দেখলেন, বুকে টোকা দিয়ে দেখলেন, জিভ দেখলেন, চোখ উল্টে দেখলেন। তারপর কটমট করে চাইলেন গৃহকর্তার চোখের দিকে: ছেলেকে নিশ্চয়ই মুড়ি খাইয়েছেন?

গৃহকর্তা তো অবাক। আমতা আমতা করে স্বীকার করল যে সত্যিই ছেলেকে মুড়ি খাওয়ানো হয়েছে। নাড়ি টিপেই যে কবিরাজ পেটের কথা বলে দিতে পারে, আর যাই হোক, তার কাছে মিথ্যে বলা চলে না। স্বীকারোক্তি শুনে উপস্থিত সবাই মোহিত হয়ে ধন্য ধন্য করল কবিরাজ মশায়কে। মুড়ি খাওয়া বারণ করে দিয়ে আবার নতুন ওষুধ (অর্থাৎ, অন্য আকৃতির সেই একই ওষুধ) দিয়ে বেরিয়ে গেলেন কবিরাজ মশায় সবার বাহবা ও সম্ভ্রমের দৃষ্টি উপেক্ষা করে। এদিকে ছেলেও তাজ্জব হয়ে গিয়েছে, বাইরে বেরিয়েই মুগ্ধকণ্ঠে বাবাকে জিজ্ঞেস করল: বাবা, তুমি মুড়ির কথা জানলে কি করে?

কবিরাজ মশায় মুচকি হেসে বললেন: ওরে গর্দভ, ছোঁড়ার খাটের নিচে কয়েকটা মুড়ি পড়ে ছিল, তাই দেখে। চোখ-কান সব-সময়ে খোলা রাখতে হয়।

ছেলেও শিখে নিল কৌশলটা। তারপর কবিরাজ মশায় গত হলেন, ছেলে হলো কবিরাজ। ভালয় ভালয় কেটে গেল কয়েক মাস, তারপর এক কঠিন রোগীর পাল্লায় পড়ল কবিরাজপুত্র। আরেক বাড়িতে আরেক ছেলের বিষম জ্বর, ওষুধে কাজ হচ্ছে না। আবার ডেকে পাঠানো হলো কবিরাজপুত্রকে। পুত্র গিয়ে দেখে ছেলের খাটের নিচে একটা লাটিম। কাউকে কিছু না বলে দশ মিনিট ধরে সে রোগীর নাড়ি দেখল, বুকে টোকা দিয়ে দেখল, জিভ দেখল, চোখ উল্টে দেখল। তারপর কটমট করে চাইল গৃহকর্তার চোখের দিকে। বলল: ছেলেকে নিশ্চয়ই লাটিম খাইয়েছেন?

তারপর?

বুঝতেই পারছেন। অন্তর্নিহিত মূল ব্যাপারটা না বুঝে শুধু কৌশল মুখস্থ করলে এই অবস্থা হয়। কাজ তো হয়ই না, উপরন্তু কপালে জোটে অসম্মান। লাভ হয় না।

কাজেই কিছু কৌশল রপ্ত করলেই চলবে না। আপনার ঐশ্বর্যের প্রসঙ্গে পরে আসব, আপাতত মানব-প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু মৌলিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে আপনাকে। একটু তেতো লাগলেও তত্ত্বও শিখতে হবে কিছুটা। ঠিক? রাজি?

গেল ভূমিকা।

এইবার আসুন সরাসরি আলোচনায় নেমে পড়া যাক। তার আগে ছোট্ট একটা অনুরোধ: একটা বলপেন তৈরি রাখুন হাতের কাছে, এই বইয়ের যেখানে যে কথাটা আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হবে তার নিচে দাগ দিতে দিতে এগিয়ে যান সামনের দিকে। এ বই থেকে সত্যি সত্যিই কোন উপকার পেতে হলে দাগ দেয়াটা দরকার। কেন এই অনুরোধ করছি তার ব্যাখ্যা দেব আমি বইয়ের শেষে।

বলপেন নিয়েছেন?

চলুন, এবার এগোনো যাক সামনে।

আত্মপ্রেম

কয়েকটি কথা শুধু মেনে নেয়া নয়, মনের মধ্যে ভাল মত বসিয়ে নেয়া দরকার আমাদের সবার। আমরা প্রত্যেকটি মানুষ আলাদা। আমাদের সবার সুখ, সমৃদ্ধি বা জনপ্রিয়তার ধারণা আলাদা। আমাদের চাহিদা আলাদা। আমার যাতে সুখ, আপনার সুখ হয়তো তাতে নয়, অন্য কিছুতে। কিন্তু আমাদের সবাইকে, যে যেই পেশাতেই থাকি না কেন, ডাক্তার, মোক্তার, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী, শিক্ষক, সাংবাদিক বা গৃহিণী—যে যাই হই না কেন, চাহিদা পূরণের জন্যে যেতে হবে একই জায়গায়। মানুষের কাছে। যদি সফল হতে হয়, শিখতে হবে কিভাবে চলতে হয় মানুষের সাথে। ব্যক্তিগত সুখ শান্তিই বলুন আর সামাজিক সাফল্য বা প্রতিষ্ঠাই বলুন, এ সবকিছু শতকরা নব্বই ভাগ নির্ভর করে অপর মানুষের উপর। কতটা সুখ বা সাফল্য অর্জন করবেন সেটা নির্ভর করবে মানুষের সাথে আপনি কতটা মানিয়ে চলতে পারছেন তার উপর।

কিন্তু চলারও আবার রকম-ফের আছে। আপনি যদি মাটিতে নুয়ে পড়ে কাদা-মাটি বা পাপোশ হয়ে যান, বিনয়ের অবতার হয়ে সবাইকে সুযোগ দেন আপনাকে মাড়িয়ে এগিয়ে যেতে, সেটাও এক রকম চলা। কিংবা আপনি যদি নিজেই সবাইকে মাড়িয়ে চলবার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, সমস্ত বিরোধিতা পায়ে দ'লে স্বৈরাচারী শাসকের ভূমিকা গ্রহণ করে আর সবাইকে পাপোশে পরিণত করতে অভ্যস্ত করে থাকেন নিজেকে, সে-ও এক রকম চলা। এ ধরনের চলা কারও শিখতে হয় না। সবাই যার যার মত কিছু নিয়ম বের করে নিয়ে চলে। এমন কি পাগলেরও নিজস্ব পন্থা আছে মানুষের সাথে মানিয়ে চলবার। এইসব পন্থা হয় অতি-স্বার্থপরতা, নয়তো অতি-নিঃস্বার্থপরতা—কোনটাই মানুষের জীবনকে সুখী ও সফল করবার জন্য উপযুক্ত নয়।

কাজেই আমাদের এমন একটা পথ বের করে নিতে হবে যাতে মানুষের সাথে মিশব ঠিকই, তাদের সাথে উঠব, বসব, চলব, ফিরব, কাজ করব—কিন্তু কেউ কারও 'অহমে'র উপর চড়াও হব না। এই একটি জিনিস—অহম—আমাদের কাছে মহামূল্যবান ধন। একে পীড়িত করে কোন মানুষই সুখী হতে পারে না। একে তাজা রেখে উৎফুল্ল হৃদয়ে কি করে মানুষের মধ্যে মানুষের মত বাস করে সুখী হতে পারি, আলোচনার মাধ্যমে সেই রাস্তাই খুঁজে বের করব আমরা।

হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির ব্যুরো অফ ভোকেশনাল গাইডেন্স চাকরি থেকে বরখাস্ত এক হাজার লোকের মধ্যে গবেষণা চালিয়ে দেখেছে, এঁদের শতকরা তেত্রিশ জন চাকরি খুইয়েছেন কাজে অপারদর্শিতার জন্যে, বাকি সবাই বরখাস্ত হয়েছেন মানুষের সাথে মানিয়ে চলতে পারেননি বলে। ডক্টর অ্যালবার্ট এডওয়ার্ড উইগামের গবেষণায় শেষোক্তদের শতকরা হার দেখা যায় আরও বেশি। চার হাজারের মধ্যে

তিন হাজার ছয়শো জন অর্থাৎ শতকরা নব্বই জনই চাকরি হারিয়েছেন মানুষের সাথে মানিয়ে চলতে পারেননি বলে।

আপনার নিজের চারপাশেই একবার চোখ বুলিয়ে দেখুন না। সুখী সফল ও জনপ্রিয় যারা তারা কি ক্ষুরধার মস্তিষ্কের বা আশ্চর্য কোন দক্ষতার অধিকারী? তারা কি আপনার বা আমার চেয়ে বেশি সপ্রতিভ বা স্মার্ট বলেই ওই অবস্থায় পৌঁছতে পেরেছে? লক্ষ করলেই দেখবেন, তা কিন্তু নয়। আমার-আপনার মতই তারাও সাধারণ মানুষ। তাহলে তফাৎটা কোথায়? তফাৎ তাদের মানুষের সাথে মিশবার বিশেষত্বে। মানুষের সাথে চলবার সহজ কৌশল শিখে নিয়েছে তারা।

আমরাও শিখে নেব। কিন্তু তার আগে মেনে নেব মানব চরিত্রের চারটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। এক—আমরা সবাই আত্মপ্রেমিক। দুই—আমরা পৃথিবীর আর সব কিছুর চেয়ে আমাদের নিজের ব্যাপারে অনেক বেশি আগ্রহী এবং উৎসাহী। তিন—আমরা প্রত্যেকে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবতে ভালবাসি, উল্লেখযোগ্য কিছু একটা হতে চাই। চার—আমরা সবাই চাই অন্যের প্রশংসা ও সমর্থন, যাতে আমরা নিজেরা নিজেদেরকে আরও বেশি করে পছন্দ ও সম্মান করতে পারি।

এই চারটি সত্যকে মনের মধ্যে ভালমত বসিয়ে নিতে পারলে আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে আসলে আমরা সবাই তৃষ্ণার্ত। আত্মপ্রেমের এই তৃষ্ণা অন্ততঃপক্ষে কিছুটা না মিটলে নিজের উপর থেকে মনোযোগ সরিয়ে অন্য কিছুতে নিবিষ্ট হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। নিজেকে যদি নিজের কাছে ভাল না লাগে অন্যকে ভাল লাগা বা তার প্রতি বন্ধুসুলভ আচরণ করা আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হয় না।

একসময়ে লোকে মনে করত, এমন কি অনেক মনস্তত্ত্ববিদও মনে করতেন, আত্মপ্রেম বা আত্মকেন্দ্রিকতা বিশ্রী এক মানসিক রোগ। আত্মকেন্দ্রিকতা ও আত্মপ্রেম কোনভাবে দূর করতে পারলেই মানুষের জীবনে সুখ-শান্তি আসতে পারে, নচেৎ নয়। মনে করত, যুক্তিতর্কের মাধ্যমে আত্মপ্রেমিকের গর্ব কিছুটা খর্ব করে দিতে পারলে, তাকে ছোট প্রমাণ করতে পারলে কিংবা বেধড়ক পিটিয়ে টিট করে দিতে পারলে সিধে হয়ে যাবে। কিন্তু এ সবে কোন কাজ হয়নি কোনদিন। আঘাত পেয়ে আরও আত্ম-সচেতন হয়ে উঠেছে মানুষ, হয়ে পড়েছে আরও অসামাজিক, অমিশুক, বিরোধী মনোভাবাপন্ন।

আধুনিক ক্লিনিকাল সাইকোলজিস্টরা আবিষ্কার করেছেন, আসলে অতি-আত্মসচেতনতা অতিশয় আত্মপ্রেমের থেকে জন্ম নেয় না, বরং উল্টোটাই সত্য: আত্মপ্রেমের অভাব থেকেই সৃষ্টি হয়। নিজের সম্পর্কে নিজের ভাল ধারণা থাকলে, নিজের সঙ্গে নিজের পরিষ্কার বোঝাপড়া থাকলে, অন্যের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনে কারও অসুবিধে হয় না। আত্মপ্রেম ত্যাগ করে কাউকে মানুষের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে বলার কোন মানেই হয় না, লাজুক আত্মকেন্দ্রিক বা গর্বিত আত্মম্ভরী লোকের জন্যে একমাত্র ওষুধ হচ্ছে আরও আত্মপ্রেম। নিজেকে ভালবাসতে পারলে অন্যকে ভালবাসার মত অবস্থায় পৌঁছবে সে। নিজের প্রতি নিজের অসন্তোষ দূর হলেই জগতের প্রতি অসন্তুষ্ট বিরক্ত তিরিক্ষি ভাব ত্যাগ করে সহনশীল হতে পারবে

মানুষ। দ্ব্যর্থহীন ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে মানুষের আত্মপ্রেমের ক্ষুধা বা তৃষ্ণা দৈহিক ক্ষুধা তৃষ্ণার মতই স্বাভাবিক ব্যাপার। শরীরের জন্যে খাদ্য যেমন প্রয়োজন, মানুষের মনের জন্যে ঠিক ততটাই দরকার আত্মার খাদ্য: সম্মান, সমর্থন ও সার্থকতা।

অতৃপ্ত আত্মা পাজি আত্মা। যে লোক তিন বেলা করে ভরপেট আহার করে, পাকস্থলী নিয়ে মাথা ঘামাবার তার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু দু'চার দিন যদি তাকে না খাইয়ে রাখা যায়, তাহলে তার মধ্যে নানান সব পরিবর্তন লক্ষ করা যাবে। হাসি খুশি দয়ালু ভাল মানুষটির মধ্যে খিটখিটে মেজাজের লক্ষণ দেখা দেবে, রসরসিকতা আর ভাল লাগবে না তার কাছে, সব কিছুর মধ্যেই ত্রুটি খুঁজে পাবে সে, যখন-তখন মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করে বসবে। এমনি অবস্থায় শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরা তাকে যদি পরামর্শ দেয় যে পাকস্থলী-সচেতনতায় ভুগছে সে, পাকস্থলীর কথা বেমালুম ভুলে গেলেই এবং মনটা বাইরের অন্য কিছুতে ন্যস্ত করলেই মিটে যাবে তার সমস্যা—তাহলে এই সৎ পরামর্শ কাজে লাগানোর উপায় থাকে না ক্ষুধার্ত ব্যক্তির। এই লোকটির অবস্থার উন্নতি করতে হলে, অর্থাৎ তার পাকস্থলী-কেন্দ্রিকতা দূর করতে হলে একটিই মাত্র রাস্তা আছে—সেটি হচ্ছে প্রকৃতির দাবি মেনে নেয়ার ব্যবস্থা করা। তাকে খেতে দিতে হবে। তা নইলে সে আর কিছুতে মন দিতে পারবে না।

আত্মকেন্দ্রিক লোকের বেলাতেও এই একই নিয়ম। তাকে নিজের বাইরের আর কিছুতে মন দিতে বলা অর্থহীন। পিটিয়েও তার আত্মসচেতনতা দূর করা যাবে না। আত্মার খাদ্য না পেলে সে নিজের কাছ থেকে মুক্তি পাবে না কিছুতেই।

কাজেই আত্মপ্রেমকে খারাপ চোখে দেখব না আমরা, বরং চেষ্টা করব আত্মপ্রেমের চাহিদা পূরণ করে নিতে। চেষ্টা করব অপরের আত্মপ্রেমের চাহিদা পূরণ করে দিতে।

আত্মমর্যাদা

আমরা জেনেছি: আত্মমর্যাদার গোড়ার কথা আত্মপ্রেম। আত্মপ্রেমের অভাব মানুষকে ছোট করে দেয়। আত্মপ্রেমে পরিতৃপ্ত মানুষের সাথে চলা অনেক সহজ। তারা থাকে হাসি-খুশি, উদার, সহিষ্ণু, অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবধারা জেনে বা মেনে নিতে আগ্রহী। নিজের প্রাথমিক প্রয়োজন মিটিয়ে নিয়েছে তারা, তাই অন্যের প্রয়োজনের কথা ভাবতে পারে। আত্মমর্যাদার এমন একটা মাত্রা তারা অর্জন করে নিয়েছে যে ছোটখাট এক-আধটা ঝুঁকি নেয়ায় তাদের ভয়ের কিছুই নেই। ভুল হয়ে গেলে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই। এমন কি, অল্প-বিস্তর সমালোচনা বা বক্রোক্তিও বেশ সহজেই হজম করে নিতে পারে। কারণ, সেসব তাদের আত্মমর্যাদায় তেমন কোন গুরুতর কমতি ঘটাতে পারে না, জমার খাতায় রয়েছে আরও প্রচুর।

আগেই বলেছি, যারা সত্যিই বড় তাদের সাথে চলা সহজ। গোলমাল যা বাধে তা ওই চুনোপুঁটিদের সাথেই। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এক সৈনিক ধমকে উঠেছিল যুদ্ধক্ষেত্রে একটা ম্যাচের কাঠি জ্বলে ওঠায়: পুট আউট দ্যাট ড্যাম ম্যাচ! পরমুহূর্তে কলজে শুকিয়ে গেল তার ভয়ে—ম্যাচ জ্বালিয়েছিলেন বাঘা জেনারেল পার্শিং। আমতা আমতা করে ক্ষমা প্রার্থনা করতেই তার পিঠ চাপড়ে দিলেন জেনারেল, বললেন: ঠিক আছে, বাছা, ঠিক আছে। আমি যে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট নই সেজন্যে খোদার কাছে হাজার শোকর করো।

সাধারণ এক সৈনিকের কটু মন্তব্যে একজন জেনারেলের আত্মমর্যাদায় চোট লাগে না।

আত্মমর্যাদার লেভেল যখন যথেষ্ট পরিমাণে নিচে থাকে তখনই ঝগড়া-ফ্যাসাদের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। যে-কোন কিছুই তখন হামলা বলে মনে হতে পারে—এমন কি, একনজর তির্যক চাহনি, বা সামান্য একটা কড়া কথাই মনে হতে পারে মহাপ্রলয়। সাধারণ কোন নৈর্ব্যক্তিক মন্তব্যকে মনে হতে পারে অপমানজনক শ্লেষ, এমন কি রেডিওর মাধ্যমে অপরিচিত কারও প্রবন্ধ-পাঠ শুনেও মনে হতে পারে ব্যাটা ব্যক্তিগত আক্রমণ করছে।

আত্মমর্যাদার অভাব কাউকে মুষড়ে ম্রিয়মান করে দেয়, কাউকে আবার করে তোলে আত্মম্ভরী, ডাঁটিয়াল। গর্বে যাদের মাটিতে পা পড়ে না, বড় বড় বোল চালের মাধ্যমে প্রভুত্ব বিস্তার করতে চায় সবার উপর, সবসময় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে তৎপর—তারাও আসলে ভুগছে আত্মপ্রেমের অভাব থেকেই। এদের সাথে চলতে হলে দুটো ব্যাপার আপনার মনে রাখতে হবে। এক, নিজের সম্বন্ধে এদের ধারণা খুব নিচু বলেই এদের সার্বক্ষণিক আপ্রাণ চেষ্টা আপনাকে ছোট ও নগণ্য প্রমাণ করে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাবান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবার দিকে। দুই,

এরা ভীত। এদের আত্মমর্যাদাবোধ এতই ঘাটতির দিকে যে সব সময় ভয় পাচ্ছে, আপনার কাছ থেকে ছোট্ট একটা গুঁতো খেলেই সেটা একেবারে ধুলোয় মিশে যাবে। যতক্ষণ না পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছে যে আপনি এদের আত্মমর্যাদা ধরে টানাটানি দেবেন না, ততক্ষণ কিছুতেই কঠোরতার বর্ম খুলে রেখে সহজ হতে পারবে না এরা আপনার সাথে। ঝুঁকি নেয়ার উপায় নেই, আগে থেকে জানবার উপায় নেই আর সবাই কে কোন্ মুডে আছে, তাই সবার সাথেই ডাঁট বজায় রাখবার চেষ্টা করে তারা—সহজভাবে, সমমর্যাদার ভিত্তিতে মিশতে পারে না মানুষের সাথে, আত্মরক্ষার জন্যে আশ্রয় নেয় আত্মম্ভরিতার দুর্গে। প্রথম সুযোগেই আপনাকে হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করবে এরা, পাছে আপনি এদের হেয় করে দেন কোনভাবে।

ইনফিরিওরিটি এবং সুপিরিওরিটি কমপ্লেক্সের গোড়ার কথা যখন জানা হয়ে গেছে আপনার, তখন এসবে যারা ভুগছে, এবং অন্যকে ভোগাচ্ছে, তাদের সাথে চলবার একটা কার্যকরী স্ট্র্যাটেজি পেয়ে যাচ্ছেন আপনি সহজেই। আপনি যখন জানেন আত্মপ্রেমের ঘাটতিই এই গোলমালের মূল কারণ, তখন এদের সমুচিত শিক্ষা দেয়ার, কড়া ধমক দিয়ে দাবিয়ে দেয়ার বা আর কোনভাবে শায়েস্তা করবার স্বাভাবিক ইচ্ছেটা দমন করতে পারবেন একটু চেষ্টা করলেই। কারণ আপনি জানেন, এদের আত্মমর্যাদাবোধ যত কমের দিকে যাবে ততই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে এদের সাথে চলা, ওভাবে এদের কোনদিন বশে আনা যাবে না। এদের সাথে তর্ক বা ঝগড়া করে লাভ নেই—পিটিয়েও সিধে করতে পারবেন না। অথচ এই ধরনের গোলমেলে লোক হরহামেশা চোখে পড়বে আপনার, এমন সব গুরুত্বপূর্ণ পদে বা অবস্থায় রয়েছে এই ধরনের অসংখ্য লোক যে এদের এড়িয়ে চলবেন তারও উপায় নেই। এদের সাথে মিশতেই হবে আপনার।

এইসব গোলমেলে লোকের একটাই মাত্র ওষুধ: এদের আত্মমর্যাদাবোধ বাড়িয়ে দিন। এদের নিজের সম্পর্কে নিজের ধারণা যদি খানিকটা উঁচু করে দিতে পারেন, এদের আত্মপ্রেমের তৃষ্ণা যদি কিছুটা মিটিয়ে দিতে পারেন, দেখবেন ভোজবাজির মত কাজ হবে—মুহূর্তে দূর হয়ে যাবে তর্জন-গর্জন, বদমেজাজ বা দুর্ব্যবহার।

মনে রাখবেন, ক্ষুধার্ত কুকুর পাজি কুকুর। ভরপেট খেতে দিলেই ঠাণ্ডা হয়ে যায় তার ফাইটিং স্পিরিট। এই সত্য যে কেবল বদরাগী বা অসহযোগী লোকের বেলাতেই প্রযোজ্য তা নয়, স্বাভাবিক সাধারণ মানুষের বেলাতেও সমভাবেই প্রযোজ্য। যে-কোন লোকের আত্মমর্যাদাবোধ যদি আপনি বৃদ্ধি করতে পারেন, তাকে আগের চেয়ে অনেক বেশি অমায়িক, সহানুভূতিশীল ও সাহায্যোন্মুখ পাবেন।

তাই বলে সস্তা চাটুকারিতায় বাজিমাৎ করতে পারবেন না। অন্যের মধ্যে সত্যি সত্যিই প্রশংসার যোগ্য কিছু খুঁজে বের করতে হবে আপনার। এ ব্যাপারে পরে আমরা বিশদ আলোচনা করব, কিন্তু তার জন্যে অপেক্ষা না করে আজ থেকেই আপনি প্র্যাকটিস শুরু করে দিতে পারেন। চেষ্টা করলেই দেখবেন, এটা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। দোষ যেমন আছে, তেমনি প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই

প্রচুর পরিমাণে ভাল গুণও রয়েছে। খুঁজলেই পেয়ে যাবেন। সেই গুণের প্রশংসা পেলে, এবং আপনি যে কার্যোদ্ধারের জন্যে চাটুকারিতা করছেন না সেটা বুঝতে পারলে বৈরী মনোভাব ত্যাগ করতে বাধ্য হবে যে-কোন গোলমেলে লোক। প্রশংসার ব্যাপারে দরকার-অদরকারের ধার না ধেরে যদি আগামী একটা সপ্তাহ দৈনিক অন্তত পাঁচজনকে মন খুলে প্রশংসা করতে পারেন—দেখবেন, জীবনটা অন্যরকম লাগছে। এই ব্যাপারে কার্পণ্য করবেন না, বাছ-বিচার বা পার্শিয়াল্টি করবেন না। অকাতরে বিলান এই সম্পদ। আপনার উচ্ছ্বসিত সৎপ্রশংসা পেলে ধন্য হয়ে যাবে মানুষ—আপনার সাহায্য পেয়ে নিজেকে সে আরও ভালবাসতে পারবে, মর্যাদাবান মনে করতে পারবে, ফলে অন্যকে সাহায্য বা সহযোগিতা করায় আর কোন বাধা থাকবে না।

মনে রাখবেন, মানুষ যা-ই করে—কিংবা করা থেকে বিরত থাকে—তার পিছনে আত্মমর্যাদা বৃদ্ধিই প্রধান কারণ। কাজেই নিছক উচিত-অনুচিতের যুক্তি-তর্ক দিয়ে যদি কাউকে কিছু বোঝাতে বা তাকে দিয়ে কিছু করাতে না পারেন, এমন যুক্তি খুঁজে বের করুন যাতে সে নিজের মর্যাদা বৃদ্ধির সুযোগ পায়। সবার ক্ষেত্রেই এই কথা সমান ভাবে প্রযোজ্য—স্বামী, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, বয়-বেয়ারা, ডিলিং ক্লার্ক, ক্রেতা-বিক্রেতা, উজির-নাজির—সব।

হয়তো এসব কথা আপনার জানা আছে। কিন্তু সত্যি করে বলুন তো, প্রয়োগ করছেন কি?

যাই হোক, প্রয়োগের প্রসঙ্গে পরে আসব আমরা। এখন দেখা যাক এ পর্যন্ত কি শিখলাম।

ক। আমরা সবাই আত্মপ্রেমিক।

খ। আমরা পৃথিবীর আর সব কিছুর চেয়ে আমাদের নিজেদের ব্যাপারে অনেক বেশি আগ্রহী ও উৎসাহী।

গ। আমরা প্রত্যেকেই নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবতে ভালবাসি, উল্লেখযোগ্য কিছু একটা হতে চাই।

ঘ। আমরা সবাই চাই অন্যের প্রশংসা ও সমর্থন, যাতে আমরা নিজেরা নিজেদের আরও বেশি করে পছন্দ ও সম্মান করতে পারি।

ঙ। অতৃপ্ত আত্মা পাজি আত্মা।

চ। অন্যের আত্মপ্রেমের তৃষ্ণা মিটিয়ে দিলে মুহূর্তে বৈরী মনোভাব ত্যাগ করে বন্ধুভাবাপন্ন অমায়িক হয়ে উঠবে।

ছ। নিজেকে ভালবাসতে না পারলে অন্যকে ভালবাসা যায় না।।

জ। আত্মমর্যাদার অভাব মানুষকে গোলমেলে আর ঝগড়াটে করে তোলে।

ঝ। মানুষকে সাহায্য করুন যাতে সে নিজেকে বাহবা দিতে পারে।

ঞ। মানুষ যাই করে—কিংবা করা থেকে বিরত থাকে—তার পিছনে আত্মমর্যাদা বৃদ্ধিই প্রধান কারণ।

ঐশ্বর্য

আমরা জেনেছি, সব মানুষই নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবতে ভালবাসে। প্রত্যেকেই চায় আর সবাই তাকে লক্ষ করুক, মেনে নিক, মূল্য দিক, প্রশংসা করুক। এটা মানব-প্রকৃতির সাধারণ এক বৈশিষ্ট্য। সবার মধ্যেই রয়েছে এই চাহিদা। কেউ ব্যতিক্রম নয়।

আমরা আরও জানি, যে মানুষ অন্যের চাহিদা মেটাতে পারে, সে জনপ্রিয়। তার সাথে বন্ধুত্ব করতে চায় সবাই।

এবার দেখা যাক, এ সত্য জানায় আমাদের কি কি লাভ হতে পারে।

মনস্তত্ত্ববিদ লেস গিবলিন বলছেন: আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে অন্যের চাহিদা মিটাবার মত যথেষ্ট ঐশ্বর্য রয়েছে। দুঃখের বিষয় আমরা বেশির ভাগ মানুষই সে ঐশ্বর্য অনর্থক জমিয়ে রাখি নিজের কাছে। মাঝে মাঝে ছিটেফোঁটা যা ব্যয় করি, তাও কৃপণের মত। বেশির ভাগ মানুষ জানিই না কি বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক আমরা।

চাহিদার স্বরূপ এবং আপনার ঐশ্বর্যের পরিমাণ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকলেই অনায়াসে মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারবেন আপনি। ইচ্ছে করলে আপনি যে-কোন মানুষের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারবেন। ইচ্ছে করলেই তাকে সাহায্য করতে পারবেন নিজেকে আরও বেশি পছন্দ করতে, নিজেকে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ ভাবতে। ইচ্ছে করলেই তাকে উপলব্ধি করাতে পারবেন যে তাকে সসম্মানে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে, তার ভাল কাজের প্রতি আপনার সমর্থন আছে।

অর্থাৎ, মানুষের মৌলিক চাহিদা মিটাচ্ছেন আপনি।

আপনার মধ্যে যে বিপুল ঐশ্বর্য আছে, অকাতরে বিলাতে হবে সেসব যদি আপনি জনপ্রিয়তা চান। কার্পণ্য করবেন না, দরাদরি করবেন না, পার্শিয়াল্টি করবেন না। আপনার ঐশ্বর্য কমে যাওয়ার ভয় নেই, বিলিয়ে দিতেও খরচা নেই এক পয়সা। কাজেই সবার মধ্যে দু'হাতে বিলিয়ে দিন—কোন কিছুর আশায় বা কাজ উদ্ধারের জন্যে ঘুষ হিসেবে নয়—এমনি। বহুগুণ হয়ে ফিরে আসবে আপনার দান আপনারই কাছে।

যে-মানুষ সাফল্যের চরম শিখরে পৌঁছে গেছে, তাকেও বাদ দেবেন না—ভুলেও ভাববেন না বিখ্যাত হয়েই তার গুরুত্ব উপলব্ধির প্রয়োজন বা চাহিদা মিটে গেছে। আপনার স্বীকৃতির জন্যে সবাই লালায়িত। সে-ও।

এই লেখা যাঁরা পড়ছেন তাঁরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের থেকে আলাদা। খাওয়ায়, পরায়, চলায়, কথায়, রুচি ও পছন্দে সবাই সবার থেকে আলাদা। কিন্তু একটা ব্যাপারে সবার সাথেই সবার মিল রয়েছে: প্রত্যেকে চান আর সবাই আপনার

গুরুত্ব ও মূল্য বুঝুক, স্বীকার করে নিক। এ ব্যাপারটা এমনই যে শুধু নিজে বুঝেই সন্তুষ্ট হওয়া যায় না, আমরা সবাই চাই আর সবাইও মেনে নিক। নিজের গুরুত্ব বুঝতে গিয়েও আমরা পর-নির্ভরশীল, অন্যের সাহায্য চাই। অন্য মানুষের চোখে যদি আমাদের গুরুত্ব ধরা পড়ে, কেবল মাত্র তাহলেই নিশ্চিন্ত হতে পারি যে সত্যিই আমরা গুরুত্বপূর্ণ।

বুঝলাম—আমি যদি মানুষের সাথে আমার সম্পর্কের উন্নতি চাই, তাহলে তার কাছে তার নিজের গুরুত্ব বৃদ্ধি করতে হবে। কিন্তু কিভাবে? কিভাবে বৃদ্ধি করব তার আত্মমর্যাদা?

এর সহজ তিনটি উপায় আছে।

এক

সত্যিই মানুষকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করুন। আগেই বলেছি, ভুয়ো প্রশংসা বা চাটুকারিতায় কোনদিন কোন কাজ হয় না। মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কে চালবাজি খাটে না—কারণ, সব মানুষের ভিতরেই এক মহাজ্ঞানী অবচেতন মন রয়েছে, সে ঠিকই বুঝে নেয় কে সৎ আর কে ভড়ং করছে। সততার সাথে সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করতে হবে আপনার, পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ মূল্যবান। এতই মূল্যবান যে সাত রাজার ধন দিয়েও কারও জীবনের মূল্য পরিশোধ করা যায় না। কয়েকটা বছরের জন্য একবারই এসেছে সে এই দুনিয়ায়, চলে যখন যাবে, ওর অভাব পূরণ হবে না কোনদিন। সে এক কথায় ইউনিক—অনন্য। আপনি যদি মনে মনে বিশ্বাস করেন যে পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ গুরুত্বপূর্ণ, তাহলে মুখে বলতে হবে না, যার সাথে মিশবেন সে আপনিই বুঝে নেবে আপনার মনের ভাব।

দুই

মানুষকে মন দিয়ে লক্ষ করুন। নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন, আপনার চারপাশের সব জিনিসই আপনি লক্ষ করেন না। চারপাশের এত রকমের এত জিনিস রয়েছে, সব লক্ষ করা সম্ভব নয়। কি করেন? বাছাই করে নেন। কোন্ জিনিস বা কাজে মনোযোগটা যায়? যেটাকে আপনি গুরুত্বপূর্ণ বা আকর্ষণীয় বলে মনে করেন।

পাঁচজন মানুষ আপনারা হয়তো অপরিচিত রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, আশপাশে লক্ষণীয় অনেক কিছুই রয়েছে, কিন্তু একেকজন লক্ষ করছেন একেক জিনিস। কেন? পছন্দ ও আগ্রহের বিভিন্নতা রয়েছে আপনাদের মধ্যে। আপনি যদি ব্যবসায়ী হন, আপনি হয়তো লক্ষ করছেন দু'পাশের দোকানগুলো কেমন সাজিয়েছে, এসব দোকানের ভাড়া বা সালামী কত হতে পারে। একজন রাস্তা মেরামতে কন্ট্রাক্টর হয়তো লক্ষ করছেন মেরামতের অভাবে কী দুরবস্থা হয়েছে রাস্তাটার, মনে মনে এস্টিমেট করবার চেষ্টা করছেন কত টাকা খরচা হবে মেরামতের। তাঁর স্ত্রী হয়তো লক্ষ করছেন অপর এক ভদ্রমহিলা কি শাড়ি পরেছেন, শাড়ি-ব্লাউজের ম্যাচ ঠিক হয়েছে কিনা। সাত বছরের ছেলেটার দৃষ্টি কার্নিসে বসা জংলী কবুতরের দিকে, ভাবছে গুলতিটা সাথে না এনে মস্ত ভুলই করেছে। কোলের

বাচ্চাটা হাঁ করে চেয়ে রয়েছে বেলুনওয়ালার লাল-নীল বেলুনের দিকে।

হয়তো পরিষ্কারভাবে কোনদিন ভেবে দেখিনি, কিন্তু মনে মনে আমরা সবাই জানি, আকর্ষণীয় কিছুর প্রতিই সবার লক্ষ যায়। কাজেই কেউ যদি আমাদের লক্ষ করে, খুশি হই আমরা; বুঝি, নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে আকর্ষণীয় কিছু পেয়েছে সে-লোক। মুহূর্তে আমাদের আত্মপ্রেমের লেভেল বেশ অনেকটা উঁচু হয়ে যায়। কারও মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারলে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি আমরা সবাই।

মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্যে হরহামেশা অনেক কিছুই করে চলেছি আমরা। ছোটবেলার সেই ডাক—আব্বা, দেখে যাও, সাইকেল চালানো শিখে ফেলেছি—এতটা প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে বড় হয়েও ডেকে চলেছি আমরা সবাইকে। কেবল পারলেই চলবে না, আর কাউকে দেখানো চাই। ছোটবেলায় মা-বাবার মনোযোগ আকর্ষণ করতে না পারলে যেমন ইচ্ছে করেই হারিকেনটা উল্টে ফেলেছি, কিংবা ছোট বোনের হাতটা মুচড়ে দিয়েছি, বড় হয়ে পরোক্ষভাবে এই একই কাজ করে চলেছি আমরা প্রায় সবাই। বেয়াড়া ব্যবহার করছি মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্যে। চূড়ান্ত অসামাজিক কাজ করে বসছি নিজের নাম জাহির করবার জন্যে।

মনোযোগ আমাদের চাই। কেউ আমাদের লক্ষ করলে বর্তে যাই আমরা।

তিন

নিজের বাহাদুরিটা চেপে যান। এটা একটু কষ্ট করে হলেও অভ্যাস করে নিতে হবে আপনাকে। সবাই চায় নিজের গুরুত্ব ও মূল্য অন্যে বুঝুক, মেনে নিক। সত্যি কথা। কিন্তু এই 'সবাই' থেকে আপনি নিজেও বাদ পড়ছেন না। আপনিও চান আপনার গুরুত্ব অন্যকে দিয়ে উপলব্ধি করাতে।

আমরা সবাই, জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে, চাই অন্যকে তাক লাগিয়ে দিতে। গল্প করতে গিয়ে কেউ যদি তার কোন বাহাদুরির কথা বলে, সাথে সাথেই শুরু করি আমরা, 'এ আর এমন কি···' দিয়ে, শুনিয়ে দিই তারচেয়েও বড় কোন বাহাদুরির কথা। নিজের জীবন থেকে না পেলে খালাতো বোনের খালু শ্বশুরের গল্প শুনিয়ে দিয়ে চেষ্টা করি সেই আলোকে নিজে উজ্জ্বল হতে। কেউ একটা হাসির চুটকি বললে সঙ্গে সঙ্গে তার চেয়েও বেশি হাসির চুটকি বলার জন্যে পাগল হয়ে যাই। কেউ যদি বলে সাভারে এক বিঘা জমি কিনেছে, মাটিতে পড়তে দিই না তার কথা, সাথে সাথেই শুনিয়ে দিই ওর এক বিঘা তো সামান্য ব্যাপার, আমাদের আরও অনেক আছে। নিজেকে বড় প্রমাণ করে শ্রোতাকে মুগ্ধ করতে গিয়ে যে তাকে অসম্মান ও ছোট করা হচ্ছে তলিয়ে দেখি না।

এই প্রবণতা থেকে উদ্ধার পাওয়ার সহজ পথ হচ্ছে সব সময় খেয়াল রাখা: অন্যকে মুগ্ধ করবার সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা তাকে জানতে দেয়া যে আপনি তার দ্বারা মুগ্ধ হয়েছেন।

কারও কথায়, কাজে ও ব্যবহারে আপনি বিস্মিত ও মুগ্ধ হলেই যে আপনি বোকা প্রমাণিত হচ্ছেন, তা কিন্তু নয়। বরং উল্টোটাই সত্য। সে আপনাকে

বুদ্ধিমান ও মিশুক লোক হিসেবে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে স্বীকার করে নেবে। যদি বড় বড় বোলচাল মারতে যান সে হয় গর্দভ ঠাউরাবে আপনাকে, নয়তো 'চাপাবাজ' খেতাব দিয়ে দেবে মনে মনে—মুগ্ধ হবে না। কারও কোন কাজে মুগ্ধ হওয়া, তাকে প্রশংসা করা বা গুরুত্ব দেয়ায় আপনার আত্মমর্যাদার হানি হবে না কোনদিক থেকেই। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায়, লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই এতে।

তেমনি কারও ভুল সংশোধন করবার বেলায়ও একটু সাবধান হওয়া ভাল। এমন অনেক ভুল কথা মানুষ বলে বা ভাবে যেটার ঠিক বা ভুলে কিছু এসে যায় না। গুলিভরা পিস্তল হাতে নিয়ে কেউ যদি মনে করে ওতে গুলি নেই—তার ভুল সংশোধন করুন। কাশির ওষুধ মনে করে কেউ যদি সালফিউরিক অ্যাসিড খাওয়ার উপক্রম করে—সংশোধন করুন। কিন্তু কেউ যদি কথায় কথায় এবারের অলিম্পিককে একত্রিশতম অলিম্পিক বলে, আলোর গতি ঘণ্টায় এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বলে, এতে কারও যদি কোন ক্ষতিবৃদ্ধি না হয়, বলুক না, কি এসে যায়? কি দরকার নিজের বিদ্যে জাহির করে তার গল্পটা মাটি করবার?

শেষ করবার আগে আবার একবার ঝালিয়ে নেয়া যাক। এই আলোচনা থেকে কি জানলাম?

আমাদের ঐশ্বর্য দু'হাতে বিলাব আমরা মানুষের মধ্যে।

কিভাবে?

মানুষকে গুরুত্ব দিয়ে। মানুষকে লক্ষ করে। মানুষের দ্বারা মুগ্ধ হয়ে।

প্রভাব বিস্তার

অনেকটা যাদুমন্ত্রের মতই একটা ক্ষমতা রয়েছে আপনার মধ্যে। নিজের অজান্তেই আপনি অন্যের ভাব ও আচরণ অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করছেন। তবে যেহেতু এ সম্পর্কে আপনার পরিষ্কার ধারণা নেই, সেইহেতু আপনার এই ক্ষমতা সব সময়ে নিজের উপকারে ব্যবহার করতে পারেন না, মাঝে মাঝে নিজের ক্ষতিও ডেকে আনেন নিজে।

হিপনোটিজম, মেসমেরিজম বা জাদুটোনা নয়—আমরা প্রত্যেকেই একে অন্যের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করি। এ সম্পর্কে ভালভাবে জেনে নিলে এই আশ্চর্য শক্তি বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে অনেকভাবে উপকৃত হতে পারবেন আপনি।

হয়তো অবাক হবেন, যদি বলি যেখানে যখনই যাদের কাছে আপনি অবহেলা বা অযৌক্তিক দুর্ব্যবহার পেয়েছেন তার শতকরা পঁচানব্বই ভাগ ক্ষেত্রে আপনি নিজেই তার জন্যে দায়ী। কথাটা কিন্তু সত্য। না জেনে আপনি তাদের আচার-ব্যবহার এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছেন যে এ-ছাড়া আর কোন রাস্তাই ছিল না তাদের।

মনস্তত্ত্বের এক আশ্চর্য নিয়ম হচ্ছে: যে মনোভাব ও আচরণ একজনের কাছ থেকে পাওয়া যায়, তার প্রতি মানুষ ঠিক অনুরূপ মনোভাব ও আচরণই প্রকাশ করবে। 'আপ্ ভালা তো জ্যগ্ ভালা' থিওরী আপনার উপর চাপাচ্ছি না, এই নিয়মে ঠিকমত কাজে লাগিয়ে কিভাবে আপনি আপনার চলার পথ নিষ্কণ্টক করে নেবেন, সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারবেন আপনি আর কিছুদূর এগোলেই। এটা আধিভৌতিক কিছু নয়, সহজ যুক্তির সাহায্যে বোধগম্য প্রতিষ্ঠিত এক সত্য।

মানুষ মাত্রেই সব সময় যথাযথ কাজটা করতে চায়। আমরা সবাই একেক সময়ে একেক ভূমিকায়, ঠিক যেন নাটক, অভিনয় করে চলেছি। কখনও স্নেহময় পিতা, কখনও দায়িত্বশীল কর্মী, কখনও সহৃদয় বন্ধু, কখনও সহনশীল স্ত্রী, কখনও আদরের দুলালী কন্যা, কখনও আবার নীচ-প্রকৃতির ভিলেন। সামনে যখন যে রকম স্টেজ সেট করা দেখছি, চুটিয়ে অভিনয় করে যাচ্ছি একটা মানানসই ভূমিকা নিয়ে। কিন্তু কোন্ অবস্থায় বা পরিবেশে কোন্টা আমাদের মানাবে, সেই যথোপযুক্ত ভূমিকা বাছাই করতে গিয়ে আমরা সবাই পরমুখাপেক্ষী। আর-সবাই আমাদের যে ভূমিকায় দেখতে চায়, অর্থাৎ, আমাদের সম্পর্কে তাদের যা ধারণা, আমরা নিজের অজান্তেই সেই ভূমিকা গ্রহণ করি।

আর একটু সোজা করে বলছি। ধরুন, একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর সাথে বিশেষ কোন কাজে দেখা করার প্রয়োজন হয়ে পড়ল আপনার। আপনি ধরেই নিলেন যে লোকটা বদমেজাজী, ত্যাঁদোড় ও ডাঁটিয়াল—কার্যোদ্ধার সহজ হবে না। অথচ তাকে দিয়ে কাজটা করানো খুবই দরকার। যেহেতু ধরে নিচ্ছেন

যে সহজ হবে না, যেহেতু আশা করছেন যে লোকটা দুর্ব্যবহার করবে, আপনি যখন তার অফিসে ঢুকছেন, একটা নেতিবাচক যুদ্ধংদেহী ভাব এসে যাচ্ছে আপনার মধ্যে। অস্পষ্টভাবে হলেও আপনার আচরণে এই ভাবটা বুঝে নিতে মোটেই অসুবিধে হবে না অফিসারের। তাকে আপনি যে ভূমিকায় দেখতে চেয়েছেন, ঠিক সেই ভূমিকাই গ্রহণ করবে সে। ফলে আপনি বিফল হয়ে ফিরে এলেন তার কাছ থেকে, বাস্তব অভিজ্ঞতা হলো যে লোকটা সত্যিই অভদ্র, বদমেজাজী, ত্যাঁদোড় ও ডাঁটিয়াল—টেরও পেলেন না যে আপনিই তাকে ঠেলে দিয়েছেন ওই বিশেষ ভূমিকায়, এছাড়া আর কোন রোলে অভিনয় করবার উপায় ছিল না তার। এই লোকটার সম্পর্কেই যদি কখনও কেউ বলে যে ভদ্রলোক অত্যন্ত ভদ্র, দয়ালু, বিনয়ী ও পরোপকারী—কিছুতেই বিশ্বাস হতে চাইবে না আপনার। যদি ভালভাবে খোঁজ নিয়ে দেখেন, দেখবেন লোকটি ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন দর্শকের সামনে সত্যিই সম্পূর্ণ ভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করে যাচ্ছে।

কারও সামনে গেলে আমরা নিজেদের অভিব্যক্তিরই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই তার ব্যবহারে। ঠিক যেন একটা আরশীতে প্রতিবিম্ব দেখছি নিজের। যখন হাসছি, আয়নার মানুষটাও হাসছে। যখন ভ্রু-কুঞ্চিত করছি, আয়নার মানুষটাও ভ্রুকুটি করছে। চিৎকার করলে সে-ও চিৎকার করছে প্রত্যুত্তরে। খুব কম মানুষই উপলব্ধি করতে পারে এই সত্যের গুরুত্ব।

কেনিয়ন কলেজের স্পীচ রিসার্চ ইউনিট গবেষণার মাধ্যমে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করেছে, চিৎকার করে কাউকে কিছু বললে প্রত্যুত্তরে চিৎকার না করে তার উপায় থাকে না। বিভিন্ন সুরে গলার স্বর কমিয়ে বাড়িয়ে সহজ কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে দেখা গেছে উত্তরদাতাও ঠিক একই সুরে উত্তর দিচ্ছে। নরম গলায় প্রশ্ন করলে উত্তর আসছে নরম গলায়, কড়া গলায় জোরে প্রশ্ন করলে উত্তর আসছে জোরে। এটা পরীক্ষিত সত্য।

ক্রোধ

উপযুক্ত সময়ে যদি আপনার এই জ্ঞান আপনি প্রয়োগ করতে পারেন, তাহলে যে কোন লোককে রেগে ওঠা থেকে বিরত করতে পারবেন আপনি সহজেই। দু'টি স্বীকৃত সত্যের উপর নির্ভর করবেন আপনি এজন্যে। প্রথমটা হচ্ছে: আপনি যে স্বরে ও সুরে কথা বলবেন, উত্তরও আসবে সেই স্বরে ও সুরে। দ্বিতীয়টা হচ্ছে: আপনি রেগে গেলে জোরে কথা বলেন, নাকি জোরে কথা বললে রেগে যান, সেটা 'ডিম আগে, না মুরগী আগে', এই রকম ধাঁধার মত ব্যাপার। দু'রকমভাবেই ঘটতে পারে ব্যাপারটা। তবে একটা কথা ঠিক—যত জোরে কথা বলবেন, ততই বাড়বে রাগ। ফলিত মনোবিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে গলার স্বর যদি নিচু রাখেন, রেগে ওঠা সম্ভব হবে না আপনার পক্ষে।

এই দুটো সত্য যখন আপনি জানেন, অন্যের ভাবাবেগের উপর আশ্চর্য এক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এসে যাচ্ছে আপনার হাতে। যখনই দেখছেন তর্ক করতে গিয়ে অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে, ঝপ করে কয়েক পর্দা নামিয়ে ফেলুন গলার

স্বর। আপনার প্রতিপক্ষ বাধ্য হবে গলার স্বর নামাতে। আর যতক্ষণ সে নিচু স্বরে কথা বলতে বাধ্য হচ্ছে, কিছুতেই রেগে উঠতে বা ভাবাবেগে আক্রান্ত হতে পারবে না। রেগে যাওয়ার পর অবশ্য এ কৌশলে তেমন কোন কাজ হবে না—রেগে ওঠার সম্ভাবনা দেখলেই প্রয়োগ করে দেখবেন, জাদুমন্ত্রের মত কাজ হবে।

উদ্যম

আপনার কোন মতবাদ বা পরিকল্পনা যদি কাউকে দিয়ে গ্রহণ করাতে চান, বা কিছু যদি কারও কাছে বিক্রি করতে চান তাহলে মনস্তত্ত্বের এই নিয়মকে আপনি কাজে লাগাতে পারেন। উৎসাহ জিনিসটা ছোঁয়াচে রোগের মত। কাউকে কোন ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলতে হলে হাজার যুক্তিতর্কে যত না কাজ হবে, তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ হবে আপনি নিজে যদি সে ব্যাপারে যথেষ্ট পরিমাণে আগ্রহী হতে পারেন। কোনও ব্যাপারে আপনার উৎসাহ যেমন মানুষের মনেও উৎসাহ জাগাবে, তেমনি আপনার উৎসাহের অভাব মানুষকে নিরুৎসাহিত করবে। গোমড়ামুখো, হতোদ্যম সেলসম্যানের দোকান থেকে কিছু কিনতে গেলে দেখবেন সব সময় কেমন একটা দ্বিধা আসে, যা কিনতে চান সেই জিনিসের প্রতিই কেমন যেন আগ্রহ কমে যায়। মনে হয়, যে বিক্রি করেছে তারই যদি কোন আগ্রহ না থাকে, আমার আগ্রহটা হয়তো একটু বাড়াবাড়িই হয়ে যাচ্ছে—নিশ্চয়ই কিছু গোলমাল আছে এর মধ্যে। কাজেই, কাউকে দিয়ে কিছু গ্রহণ করাতে হলে প্রথমে নিজের আগ্রহের তাপে গরম করে নিতে হবে জিনিসটাকে। আপনার আগ্রহ আগ্রহী করে তুলবে অন্যকে। সেই সাথে আর একধাপ এগিয়ে যদি এমন ভাব নিতে পারেন যে যা দিতে যাচ্ছেন সেটা গ্রহণ করবে অপরে, তাহলে প্রায় বাধ্য হয়েই গ্রহণ করতে হবে সেটা তার। আপনি যেমনভাবে স্টেজ সাজাবেন, তাকে যে ভূমিকা দেবেন, তেমনি অভিনয় করতে হবে তার।

আস্থা

আগ্রহ ও উদ্যম সৃষ্টির বেলায় যেমন, ঠিক তেমনি নিয়মে আপনার উপর বিশ্বাস ও আস্থা আনতে পারবেন আপনি মানুষের। এজন্যে প্রথমে আত্মবিশ্বাসী হতে হবে আপনার নিজেকে। আপনার আচরণে যদি আত্মবিশ্বাস প্রকাশ পায় কেবলমাত্র তাহলেই মানুষ আস্থা স্থাপন করবে আপনার উপর।

হয়তো লক্ষ করে থাকবেন, মাঝারি যোগ্যতার অনেক লোক সত্যিকার গুণী লোকের চেয়ে পদমর্যাদায় প্রায়ই অনেক উপরে উঠে যায়, অনেক বেশি খ্যাতি বা প্রতিষ্ঠা অর্জন করে নেই। 'সাধারণ ক্যালিবারের লোক, আজ কোথায় উঠেছে দেখো'—বলতে শোনেননি মানুষকে? এটা সম্ভব হয়েছে একমাত্র আত্মবিশ্বাসের জোরে। তার আচরণে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে, তাই মানুষ আস্থা স্থাপন করেছে তার উপর। ইচ্ছে করলে এর অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যায়, কিন্তু আমার মনে হয় এটা বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। যাঁরাই পৃথিবীতে বড় হয়েছেন, তাঁদের জীবনী ঘাঁটলে আমরা দেখতে পাব বড় হওয়ার মূলমন্ত্র তাঁদের অসীম

আত্মবিশ্বাস।

কিন্তু কি করে আত্মবিশ্বাসী হওয়া যায়? ফলিত মনোবিজ্ঞান বলছে: আত্মবিশ্বাসীর ভাব গ্রহণ করুন, আত্মবিশ্বাসীর মত আচরণ করুন, দেখবেন নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস অনুভব করছেন। আপনার এই অনুভূতির বিচ্ছুরণ ঘটবে আপনার আচার, ব্যবহার ও কাজে—আস্থা আসবে মানুষের।

আত্মবিশ্বাসীর ভাব গ্রহণ করবেন কি করে? আচরণে। আপনার আচরণ দেখে ঠিকই বুঝে নেবে মানুষ আপনার নিজের সম্পর্কে আপনার কি ধারণা। কাজেই এই দিকটায় লক্ষ দিতে হবে আপনার।

মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে হাঁটুন। হতাশা, ভীরুতা, হীনম্মন্যতা, দ্বিধা, অনিশ্চয়তা, ইত্যাদি প্রকাশ পায় কুঁজো হয়ে হাঁটলে। সোজা হয়ে একটা ডোন্ট কেয়ার ভাব নিয়ে চলাফেরা করলে বহুলাংশে দূর হয়ে যায় এই পরাজিত মনোভাব—চেষ্টা করে দেখুন, আত্মবিশ্বাস অনুভব করবেন নিজের ভিতর।

আমাদের দেশে এখনও হ্যাণ্ডশেকের চল রয়েছে। প্রায়ই কারও না কারও হাত ঝাঁকাতে হয় আপনার। কাজেই আপনার জেনে রাখা ভাল যে, কে কি রকম লোক তা অনেকটা টের পাওয়া যায় হ্যাণ্ডশেকের ধরন দেখলেই। নরম দস্তানার মত আলতো করে যারা নিজের হাতটা আপনার হাতে সমর্পণ করে, তাদের আত্মবিশ্বাস বলতে কিছুই নেই। যারা কড়মড়িয়ে আপনার আঙুলের হাত গুঁড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে, জানবেন, তাদের মধ্যেও আত্মবিশ্বাসের অভাব রয়েছে—বেশি শক্তিশালী, বেপরোয়া একটা ভাব নিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করছে নিজের দুর্বলতা। যারা এই দুইয়ের মাঝামাঝি চাপ দেয়, বেশ জোরেই ধরছে কিন্তু গায়ের জোর দেখাবার চেষ্টা করছে না, ঝাঁকুনিতে মনে হচ্ছে বলতে চায়—ভাল আছি, বেঁচে আছি, সবকিছু আয়ত্তে রয়েছে আমার; তাদের উপর শতকরা নব্বই ভাগ ক্ষেত্রেই আস্থা রাখতে পারেন। মনে রাখবেন—অন্যেও আপনাকে, সচেতনভাবে না হলেও, এই বিচারেই বিচার করে নিচ্ছে।

কথার মাধ্যমে আপনি কেবল আপনার ধ্যান-ধারণাই ব্যক্ত করছেন না, আপনি নিজেকে কি মনে করেন সেটাও প্রকাশ পাচ্ছে। নিজের কণ্ঠস্বর খেয়াল করুন। আপনি কি দুর্বলের মত মিনমিন করছেন? নাকি সাহস ও আস্থার ভাব প্রকাশ করছেন আপনার কথায় বার্তায়?

কার্যোদ্ধার

অন্যের কাছ থেকে ভাল কাজ আদায় করতেও আপনি মনস্তত্ত্বের এই বিধি ব্যবহার করতে পারেন। একজন খারাপ লোক সবার কাছেই খারাপ হয় না—কারও কারও কাছে আবার সে খুব ভাল। কাদের কাছে? যারা তার কাছ থেকে ভালটা আশা করে।

ধমক দিয়ে, লজ্জা দিয়ে, হুমকি দিয়ে বা উপদেশ দিয়ে মানুষকে ভাল করা খুবই মুশকিল। এসব যখন প্রয়োগ করছেন, আপনি ধরেই নিচ্ছেন যে সে খারাপ। আসলে কিন্তু কোন মানুষই পুরোপুরি ভাল বা পুরোপুরি খারাপ হয় না। আপনি

তাকে যা মনে করছেন সে সেই ভূমিকাই গ্রহণ করছে। সেইজন্যে এসবে কোন কাজ হয় না। পক্ষান্তরে আপনি যদি তার সম্পর্কে উঁচু ধারণা পোষণ করেন, স্বাভাবিক ভাবেই তার কাছ থেকে ভাল কাজ আশা করেন, বাধ্য হবে সে ভালর ভূমিকায় অভিনয় করতে। বহু যুগ আগে ইমারসন সাহেব বলেছিলেন: মানুষকে বিশ্বাস করো, সে তোমার বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করবে। চেষ্টা করে দেখুন, কথাটা কিন্তু ফেলনা নয়।

কি শিখলাম?

১। জেনে হোক বা না জেনে হোক, আমার ভাব ও আচরণ দিয়ে আমি অন্যের ভাব ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ করছি।

২। আমার ভাবের প্রতিফলন দেখতে পাব আমি অন্যের মধ্যে—ঠিক যেমন আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবি দেখি।

৩। যার প্রতি বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করব, তার কাছ থেকে বিরোধিতা ছাড়া আর কিছুই আশা করা যায় না। আমি যেমন মঞ্চ প্রস্তুত করব তেমনি অভিনয় করবে অপরে। কড়া সুরে কথা বললে বাধ্য হবে সে কড়া সুরে উত্তর দিতে। শান্ত সুরে কথা বললে বাধ্য হবে সে ঠাণ্ডা মাথায় উত্তর দিতে।

৪। আমি উদ্যমী হলে অন্যের মধ্যে সংক্রমিত হবে আমার উদ্যম।

৫। আমি আত্মবিশ্বাসীর মত আচরণ করলে মানুষ আস্থা রাখবে আমার উপর।

৬। আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গি ও আচার-আচরণ গ্রহণ করলে নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এসে যায়।

৭। এখন থেকে মাথা উঁচু করে চলব। অর্ধেক মুখে আর অর্ধেক পেটে না রেখে পরিষ্কার খোলা গলায় স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলব।

৮। মানুষকে ধমক, লজ্জা, হুমকি বা উপদেশ না দিয়ে তার কাছ থেকে ভাল কাজ ও ব্যবহার আশা করব, তার উপর বিশ্বাস রাখব—ভাল হতে বাধ্য হবে সে।

গোড়ায় গলদ

গত আলোচনা থেকে আমরা কয়েকটা সত্য জানতে পেরেছি: এক, জেনে হোক বা না জেনে হোক, আমার ভাব ও আচরণ দিয়ে আমি অন্যের ভাব ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ করছি। দুই, আমার ভাবের প্রতিফলন দেখতে পাই আমি অন্যের মধ্যে—ঠিক যেমন আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখি। তিন, যার প্রতি বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করব তার কাছ থেকে বিরোধিতা ছাড়া আর কিছুই আশা করা যায় না। আমি যেমন মঞ্চ প্রস্তুত করব তেমনি অভিনয় করবে অপরে। চার, আমি উদ্যমী হলে অন্যের মধ্যে সংক্রমণ হবে উৎসাহের। পাঁচ, আমি আত্মবিশ্বাসীর মত আচরণ করলে মানুষ আস্থা রাখবে আমার উপর। ছয়, আত্মবিশ্বাসীর আচার-আচরণ অনুকরণ করলে নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এসে যায়। সাত, মাথা উঁচু করে চলা উচিত, কথা অর্ধেক মুখে আর অর্ধেক পেটে না রেখে পরিষ্কার খোলা গলায় স্পষ্ট উচ্চারণে বলা উচিত। এবং আট, মানুষকে ধমক, লজ্জা, হুমকি বা উপদেশ না দিয়ে তার কাছ থেকে ভাল কাজ ও ব্যবহার আশা করব, তার উপর আস্থা রাখব—বাধ্য হবে সে ভাল হতে।

কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করা হলো এর গুরুত্ব সঠিকভাবে অনুধাবনে সাহায্য হবে বলে।

এই তথ্যগুলো এবার আমরা কাজে লাগাব। এগুলোকে মানুষের সাথে চলায় বলায় কিভাবে কাজে লাগিয়ে উপকৃত হতে পারি সেটা এবার দেখা যাক।

আপনি যেখানে যার কাছেই যান, শুরুটা কিভাবে করছেন, অর্থাৎ প্রথমেই কেমন ব্যবহার করছেন বা কি কথা বলছেন তার উপরেই অনেকাংশে নির্ভর করে গোটা আলোচনা। প্রথমেই যদি হাসি-মস্করা দিয়ে শুরু করেন আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে সেটাকে গম্ভীর খাতে আনা খুবই মুশকিল—আপনার সিরিয়াস কথাতেও হা হা করে হেসে খুন হয়ে যাবে লোকে, কিছুতেই গুরুত্ব দিতে চাইবে না।

দুনিয়ার সবাই আসলে কি করতে হবে জানার জন্যে আপনার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। অন্যের আচার আচরণকে যদি প্রভাবিত করতে চান তাহলে আলোচনা যে খাতে বহাতে চান সেই ভাবটা গ্রহণ করুন শুরুতেই। যদি গুরুত্বপূর্ণ বা গভীর কোন আলাপ থাকে প্রথমে কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে সেই ভাবটাই প্রকাশ করুন। ব্যবসা সংক্রান্ত আলাপ থাকলে ঠিক সেই সুরেই শুরু করুন। যদি হাসি-তামাশার মধ্যে দিয়ে মন হালকা করতে চান, শুরু করুন মস্করা দিয়ে। উল্টোটা করতে যাবেন না।

মঞ্চ সাজানো

মনে রাখবেন, যা আশা করা হচ্ছে ঠিক তেমনি ব্যবহার করবে মানুষ। আপনি তার

সামনে যেমন স্টেজ সাজাবেন এবং তাকে যে রোল দেবেন সে ঠিক সেই ভূমিকায় যথাযথ অভিনয় করবে। কারও সাথে আলাপে 'যদি কিছু মনে না করেন,' কিংবা 'আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করছি' কিংবা 'আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে দুঃখিত' দিয়ে যদি শুরু করেন, তাহলে নিজের অজান্তেই আপনি সেই ব্যক্তিকে ঠেলে দিচ্ছেন একটা বিশেষ ভূমিকায়। ভুল মঞ্চ সাজাচ্ছেন আপনি। এই মঞ্চে সে এমন একটা ভূমিকা গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে যার পক্ষে 'কিছু মনে করা'ই স্বাভাবিক, যার 'সময় নষ্ট' করছেন আপনি, যাকে 'বিরক্ত' করছেন। এই অবস্থায় কি রকম ব্যবহার আশা করতে পারেন আপনি এই লোকটির কাছ থেকে? লোকটি যদি আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করে দোষ তার, না আপনার?

কাজেই, যখনই কারও সাথে কোন আলাপ করতে যাচ্ছেন, নিজেকে জিজ্ঞেস করুন এই আলাপের মাধ্যমে ঠিক কি চাই আমি? আলোচনাটা কোন্ খাতে এগোনো উচিত? আলোচনার ভাবধারাটা ঠিক কেমন হওয়া বাঞ্ছনীয়?—এগুলো ভালমত বুঝে নিয়ে সেই অনুযায়ী উপযুক্ত মঞ্চ প্রস্তুত করুন উপযুক্ত কথা ও ভাব দিয়ে। শুরুতেই। তাহলে আলোচনার ফলশ্রুতি দাঁড়াবে ঠিক যেমনটি চেয়েছিলেন, তাই।

আপনার আসন

আপনাকে মানুষ কিভাবে গ্রহণ করবে সেটা কিন্তু মানুষের চেয়ে অনেক বেশি নির্ভর করে আপনার নিজেরই উপর। আপনি নিজেকে যা মনে করেন মানুষ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেই মতই পোষণ করবে। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ বিধির মতই এটা মনস্তত্ত্বের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিধি। আপনার উপযুক্ত আসন আসলে আপনি নিজেই তৈরি করে নিচ্ছেন। নিজের মূল্য নির্ধারণ করছেন নিজেই। আপনি যে আসনের উপযুক্ত সেই আসনে উঠে বসুন, কেউ টুঁ শব্দটি করবে না। এই একটি ব্যাপারে দুনিয়া নির্বিকার। কেউ বাধা দেবে না আপনাকে, বরং সাহায্য করবে। কারণ দুনিয়া জানে, সত্যি সত্যিই যে বড় তার কাছ থেকে অনেক বেশি কাজ পাওয়া যাবে, তার দ্বারা উপকৃত হবে মানুষ—কাজেই তাকে বাধা দেয়া নেহায়েতই বোকামি, বাধা দিলে ক্ষতি হবে দুনিয়ারই। আপনার যোগ্যতা না থাকলে আপনি এমনিতেই ঝরে যাবেন। আপনি ছোট বা বড় হন কারও আসলে কিছুই এসে যায় না, দুনিয়া আপনাকে গ্রহণ করবে আপনি নিজেকে যা মনে করেন সেই নিরিখেই।

আচরণের প্রভাব

ঠিক যেমনটি আশা করছেন, তেমন ভাবে যদি মানুষ আপনাকে গ্রহণ না করে, খুব সম্ভব দোষটা আপনার নিজেরই। খতিয়ে দেখলেই ধরতে পারবেন নিজের ত্রুটি। আপনার আচরণই আপনার স্থান নির্দেশ করছে। আপনি যদি বাজে লোকের ভূমিকা গ্রহণ করেন, মানুষ আপনাকে বাজে লোক হিসেবেই গ্রহণ করবে। আপনার আচরণে যদি প্রকাশ পায় যে আপনি নিজেকে যোগ্য ও মূল্যবান বলে মনে করেন, সেই ভূমিকাতেই আপনাকে মেনে না নিয়ে উপায় থাকবে না মানুষের।

এখানে ছোট একটা সাবধানবাণী শুনিয়ে রাখা দরকার। অনেকে মনে করেন লোকের সাথে একটা হামবড়াই ভাব দেখালে, বা তাদের সাথে দাপট দেখালে, কিংবা বেয়াড়া কর্কশ, উদ্ধত ব্যবহার করলেই বুঝি সবাই মনে করবে নিজের সম্পর্কে ধারণা তাদের খুবই উঁচু। আসলে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উল্টো।

সত্যি সত্যিই নিজের সম্পর্কে যার উঁচু ধারণা, এই রকম হাস্যকর উপায়ে নিজেকে জাহির করবার তার কোন দরকার পড়ে না। যারা হামবড়াই ভাব নিয়ে চলে, মিথ্যে ডাঁট দেখায় যে তারা বিরাট কিছু, বুঝতে হবে তারা ভিতর ভিতর নিজেকে ছোট ও নগণ্য জানে বলেই ওই রকম চাল দেখাচ্ছে। নিজের কাছেই প্রমাণ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে ওরা যে আসলে ওরা ততটা নগণ্য নয়। এই চেষ্টা প্রমাণ করছে, আসলেই তারা নগণ্য।

সত্যিই যারা বড় তারা কখনও ডাঁট বা দাপট প্রদর্শন করে না। বরং সহজ, সুন্দর, স্বাভাবিক একটা ঘরোয়া আমেজই প্রকাশ পায় তাদের ব্যবহারে। আমরা সবাই নিজেদের যতটা বুদ্ধিমান বা হুঁশিয়ার মনে করি আমাদের অবচেতন মন তার চেয়ে অনেক বেশি ঘুঘু। আমাদের সচেতন মন যদি বা মানুষের মিথ্যে ডাঁট-বাট দেখে মোহিত হয়, অবচেতন মন ঠিকই ছদ্মবেশ ভেদ করে পরিষ্কার দেখতে পায় অন্যের আসল রূপ। মিথ্যে অভিনয় করে কেউ পার পায়নি কোনদিন, পাবেও না।

আপনিও পরীক্ষিত হচ্ছেন

এই সাথে আরও একটা ব্যাপার আছে। আপনি সত্যিসত্যিই নিজেকে কি মনে করেন কেবল যে তাই দিয়ে মানুষ আপনাকে বিচার করবে তা নয়, সেই সাথে তারা দেখবে আপনি আর সব কিছুকে কি চোখে দেখেন, সেটাও। আপনার কাজ, সহকর্মী, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিযোগী—সবার ব্যাপারে আপনি যে ভাব প্রকাশ করেন তার উপরও নির্ধারিত হয় আপনার নিজের মূল্য।

আপনি যখন কারও দোষ-গুণ বর্ণনা করছেন বা কারও বিরুদ্ধে নালিশ জানাচ্ছেন তখন কেবল যে তারই বর্ণনা বা পরিচয় দিচ্ছেন তা কিন্তু মোটেই নয়, প্রকারান্তরে আপনি নিজের দোষগুণও প্রকাশ করছেন। চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে যদি আপনি পূর্বতন কর্মকর্তার দুর্নাম করেন সেটা আপনার স্বপক্ষে যাবে না কোনদিনই। আপনি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন, সেটাকে যদি বড় করে দেখতে ও দেখাতে না পারেন তাহলে আপনাকেও বড় করে দেখবে না কেউ। তারা মনে করবে বাজে প্রতিষ্ঠানে বাজে লোকের অধীনে যে লোক কাজ করে সে নিজেও বাজে না হয়ে যায় না। প্রতিযোগীকেও কখনও ছোট করে দেখাতে নেই—এই প্রচেষ্টাই প্রমাণ করে যে আসলে তাকে ততটা ছোট বলে মনে করেন না আপনি, নইলে তার বিরুদ্ধে এত কিছু বলছেন কেন?

হাঁ-সূচক মনোভাব

কাউকে দিয়ে যদি কিছু গ্রহণ করাতে চান—পণ্যই হোক বা কোন মতবাদই হোক—প্রথমে তাকে হাঁ-সূচক মুডে আনতে হবে। ইতিবাচক মনোভাব ছাড়া কেউ

কখনও কিছু গ্রহণ করে না। এমন কতকগুলো সহজ প্রশ্ন করতে হবে যাতে সায় না দিয়ে তার উপায় নেই। বার কয়েক সম্মতি জানাবার পর আপনার আসল প্রশ্নে সম্মতি বা সায় দেয়া তার পক্ষে অনেক সহজ হবে।

তবে 'হাঁ' অনেক সময় নেতিবাচকও হতে পারে, সে ব্যাপারে সাবধান। যদি কাউকে বলেন, 'কি বিশ্রী পচা গরম পড়েছে, তাই না?' সে বলবে, 'হাঁ।' যদি বলেন, 'দেশের যা অবস্থা, কখন কি হয় বলা যায় না, সাংঘাতিক কিছু বেধে যাওয়াও বিচিত্র নয়।' সে বলবে, 'ঠিক বলেছেন।' যদি বলেন, 'দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছে বিশ্ব পরিস্থিতি, টিকে থাকাই মস্ত সমস্যা।' এরও উত্তর হবে, 'হাঁ।' কিন্তু প্রত্যেকটা কথার হাঁ-বাচক উত্তর পেলেন বটে, ইতিমধ্যেই একটা নেতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করে ফেলেছেন আপনি। এই মুডে কোনকিছু কেনা, কোন মতবাদ মেনে নেয়া বা নতুনত্বের মধ্যে যাওয়া যায় না—মানুষ হয়ে পড়ে দ্বিধান্বিত, সন্দেহপ্রবণ।

অতএব, ' আপনি কি এটা পছন্দ করেন?'—এই ধরনের সরাসরি প্রশ্ন না করে একটু ঘুরিয়ে 'বেশ সুন্দর, তাই না?' বা 'এটা নিশ্চয়ই ভাল লাগবে আপনার, ভাল না?'—এই জাতীয় কিছু প্রশ্ন করে গোটা কয়েক হাঁ-সূচক উত্তর আদায় করতে হবে আপনার প্রথমেই। সেই সাথে উত্তর পাওয়ার আগে নিজেই যদি সম্মতি-সূচক মাথা ঝাঁকান তাহলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রাজি না হয়ে উপায় থাকে না উত্তরদাতার। আপনার আচরণ প্রভাবিত করে তাকে।

ধরে নিন পাবেন

আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে ধরে নেয়া যে আপনি যেরকম প্রতিক্রিয়া চান ঠিক তাই পেতে যাচ্ছেন অন্যের কাছ থেকে। ডক্টর অ্যালবার্ট এডওয়ার্ড উইগান বলছেন, 'শান্তভাবে ধরে নিন যা বলছেন তাই করবে লোকে। এর চেয়ে জোরাল সাজেশন আর হয় না।'

আমেরিকার একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী ডক্টর পিয়ার্স পি ব্রুকস সেখানে গঠনমূলক কাজের জন্যে বিখ্যাত। অনেক লোক নিয়ে গড়তে হয়েছে তাঁকে বিরাট সব সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, সবাইকে সম্মত করতে হয়েছে নির্দিষ্ট পথে স্বেচ্ছায় কাজ করবার জন্যে। তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো আপনার সাফল্যের চাবিকাঠি কি, তিনি জবাব দিলেন: কাউকে দিয়ে কিছু করাতে হলে তাকে আমি প্রশ্ন করতে যাই না সে ওটা করতে রাজি আছে কি নেই। প্রথমেই আমি খুঁজে বের করি কাজটা করলে ব্যক্তিগত ভাবে তার কি সুবিধে হচ্ছে। কি পাবে সে এর মধ্যে—সম্মান? মহত্ত্ব? খ্যাতি? প্রশংসা?—ঠিক কোন্‌টা, কিভাবে? তারপর ধরে নিই সে ওই কাজটা করতে চায় এবং করবে। তাকে প্রাপ্যের কথা জানাই, বলি যে আমার বিশ্বাস আছে সে ওই কাজটা শুধু পারবে তাই নয়, ভাল ভাবে পারবে। ব্যস, তারপর কিভাবে কি করবে সেটা ছেড়ে দিই তারই উপর। কারণ আমি জানি, সর্বক্ষণ কারও ঘাড়ের উপর দিয়ে উঁকি দিয়ে তার কাজ তদারক করার অর্থ তার ওপর আমি বিশ্বাস রাখতে পারছি না। আমার অনাস্থা প্রকাশ করে আমি তার

কাজের ক্ষতি করতে চাই না। ধরে নিই চমৎকার ভাবে কাজটা করবে সে—দেখেছি কদাচিত ভুল হয়েছে আমার এই ধারণা।

এই নিয়মটা বিক্রয়-বাণিজ্যেও ব্যবহার করতে বলছেন ডক্টর ব্রুকস তাঁর 'হাউ পাওয়ার সেলিং ব্রট মি সাকসেস ইন সিক্স আওয়ারস্' বইয়ে। ঠাণ্ডা মাথায় ধরে নিন আপনার পণ্য ক্রেতা কিনতে যাচ্ছে, দেখবেন না কিনে বিদায় নেবার উপায় থাকবে না তার। সবাই যথাযথ ভূমিকায় অভিনয় করতে চায়। যা আশা করা হচ্ছে তাই করতে চায় মানুষ। সেক্ষেত্রে ভালটা আশা করাই ভাল। এই নিয়ম প্রয়োগ করে দেখুন, ফল পাবেন হাতে হাতেই।

খাওয়ার সময় হয়েছে, কিন্তু খেলে বেড়াচ্ছে বাচ্চাটা, কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছে না—তার ওপরও প্রয়োগ করতে পারেন এই কৌশল। টেবিলে খাবার দিয়ে কোন রকম যুক্তি তর্কের মধ্যে না গিয়ে শান্তভাবে তাকে বলুন: খাবার দেয়া হয়েছে, খেয়ে নাও। ছেলে যদি কথা না শোনায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে প্রথম বারেই যে সুফল পাবেন তা নয়, তবে বকাঝকা, অনুরোধ-উপরোধ, ইত্যাদির চেয়ে অনেক বেশি কাজ হবে এই কৌশলে।

আকর্ষণ

সবার সাথে বন্ধুত্ব করি না আমরা। এ ব্যাপারে বাছবিচার আছে আমাদের সবারই। এমন ভাল মানুষও আছে যার কথায় মধু ঝরে, নিপাট ভদ্রলোক, মিষ্টি ব্যবহার, কিন্তু তার ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে চাইবেন না আপনি। লোকটার ভালমানুষী এতই প্রকট যে স্বস্তি পান না আপনি তার কাছে গিয়ে, বরং নিজের অসম্পূর্ণতা ও দোষত্রুটির অনুভব করেন বেশি করে। অথচ কেউ আছে, যার দোষত্রুটি দেখতে পাচ্ছেন পরিষ্কার, তবু তার প্রতিই আকর্ষণ বোধ করছেন।

কেন এমন হয়? ভাল মানুষটি আপনাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে কিভাবে? ত্রুটিপূর্ণ লোকটিই বা আপনাকে টানছে কি দিয়ে?

মানুষ সচেতন ভাবে হোক বা অবচেতন ভাবে হোক পছন্দ-অপছন্দ নির্ধারণ করে নিজের চাহিদা কার কাছ থেকে কতখানি মিটবে তারই ভিত্তিতে। আপনার চাহিদা মিটাচ্ছে বলেই আপনি আকর্ষণ বোধ করছেন ত্রুটিপূর্ণ লোকটির প্রতি, ভাল মানুষটি পূরণ করতে পারছে না আপনার চাহিদা।

কি চাহিদা?

তিনটি জিনিস আমরা সবাই চাই। প্রত্যেকটি মানুষ। এক, আমি যেমন ঠিক তেমনি ভাবেই অন্যে গ্রহণ করুক আমাকে। দুই, আমার মধ্যে যা ভাল তার স্বীকৃতি ও সমর্থন দিক মানুষ। তিন, আমার গুণের প্রশংসা করুক। এই চাহিদা যদি মিটাতে পারেন আপনার প্রতিও আকর্ষণ বোধ করবে মানুষ।

প্রতিটা চাহিদা নিয়ে এবার একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

গ্রহণ

আমরা সবাই চাই দোষে-গুণে আমরা যে যেমন তাকে ঠিক সেই ভাবেই গ্রহণ করুক অন্যে। এমন মানুষ খুঁজি যে সর্বক্ষণ আমাদেরকে সমালোচনার ছুরির মুখে রাখবে না, যার কাছে সহজ বোধ করব, আড়ষ্টতা এসে রোধ করবে না স্বচ্ছন্দ আত্মপ্রকাশ। সবার সাথে আমরা সমান খোলামেলাভাবে মিশতে পারি না, অনেক রেখে ঢেকে, অনেক সংযত হয়ে চলতে হয় আমাদের মানুষের সাথে। কিন্তু সবাই চাই এমন কাউকে যার সাথে চলায়-বলায় এই সতর্কতার প্রয়োজন নেই, ভুল হয়ে গেলেও যে কিছু মনে করবে না, আমরা যেমন ঠিক তেমনি ভাবেই গ্রহণ করবে আমাদের—মোটকথা, নিজের মত হতে পারি যার সামনে।

যে আমাদের শুধরে নিতে চায়, দোষত্রুটি ওজন করে ভাল বা মন্দ রায় দেয়ার জন্যে বসে আছে দাঁড়িপাল্লা নিয়ে, প্রতিনিয়ত ধরছে ভুল, বাতলে দিচ্ছে সংশোধনের পথ—তাকে পছন্দ করা খুবই মুশকিল। সে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিচ্ছে, সে যা ভাল মনে করে, যে পথকে ঠিক মনে করে, সেইমত যে না চলবে তাকে গ্রহণ

করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তার কাছে ভাল হতে হলে তার বাঁধা ছকের মধ্যে গিয়ে ঢুকতে হবে আপনার। সহ্য হবে? আমার তো মনে হয় তার চেয়ে একটা ছাগলের সাথে বন্ধুত্ব করাও ভাল।

যাইহোক, আমি বলতে চাইছি, কার কিভাবে চলা উচিত সে ব্যাপারে কঠোর নিয়ম-কানুন আরোপ করতে যাওয়া বোকামি। তাকে তার মতই চলতে দিন। তার আচরণে যদি কিছুটা বিদঘুটে ভাব থাকে, থাকুক না। আপনার পছন্দ-অপছন্দ-মতবাদ তার ওপর না চাপিয়ে সে যেমন তাকে সেইভাবেই গ্রহণ করুন। আপনার সাহচর্যে সে যেন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে সেই ব্যবস্থা করুন।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, যারা মানুষকে পরিবর্তন না করে যে যেমন তাকে তেমনি ভাবে গ্রহণ করতে পারে, দোষ গুণ সব মিলিয়েই গোটা মানুষটাকে স্বীকার করে নিতে পারে, একমাত্র তাদের দ্বারাই প্রভাবিত হয় মানুষ, খুশিমনে শুধরে নেয় নিজের দোষত্রুটি। আসলে সমালোচনা, বক্রোক্তি বা কটূক্তি করে কাউকে শুধরানো যায় না, সে যেমন তাকে সেই অবস্থাতেই পছন্দ ও গ্রহণ করে আপনি তার মধ্যে নিজেকে পরিবর্তন করবার ক্ষমতা সৃষ্টি করছেন। বিয়ের পর অনেক বেয়াড়া বাজে লোককে ভাল হয়ে যেতে দেখা যায়। সত্যিকার কারণ যদি জিজ্ঞেস করেন (এবং সে যদি বলে) দেখবেন উত্তরটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম: আমার প্রতি আমার স্ত্রীর বিশ্বাসই বদলে দিয়েছে আমাকে। কোন যুক্তি নয়, তর্ক নয়, ঝগড়া-ফ্যাসাদ নয়—শুধু ভালবাসা আর অবিচল আস্থা। না বদলে উপায় ছিল না আমার।

যদি ভাল হও, আমি যা ভাল মনে করি যদি ঠিক সেই মত চলো, কেবলমাত্র তাহলেই তোমাকে আমি পছন্দ করব, নচেৎ তুমি আমার কাছে গ্রহণীয় হবে না—এই মানসিকতা মানুষকে বহুদূর সরিয়ে দেয়। অথচ আমরা বেশির ভাগ মানুষই ঠিক এই ভুলটাই করি। লোকের ভাল করতে গিয়ে তাকে ঠেলে দিই ধরা ছোঁয়ার বাইরে, বহুদূরে।

সাইকোঅ্যানালিস্টরা কিভাবে উপকার করছেন মানুষের? ভয়-ভীতি আর কঠিন সমস্যায় ভারাক্রান্ত একজন লোক, যে নিজের এবং অন্যের সাথে কিছুতেই খাপ খাইয়ে চলতে পারছে না, সেই লোক সপ্তাহে দু'দিন করে তাঁর সাথে কথা বলেই সেরে উঠছে কি করে? আসল কথা, চিকিৎসকের মধ্যে রোগী এমন একজনকে খুঁজে পাচ্ছে যিনি তাকে গ্রহণ করছেন সহজ ভাবে, সে যেমন ঠিক তেমনি ভাবেই। ভান বা ভণিতা করতে হচ্ছে না বলে আশ্চর্য এক স্বস্তির ভাব আসছে রোগীর মধ্যে, জীবনে এই প্রথম এমন একজন মানুষকে পেয়েছে সে যাঁর কাছে অসংকোচে উন্মোচন করছে সে নিজেকে, নিজের ভয়-ভীতি, দুশ্চিন্তা-আকাঙ্ক্ষা, দোষ-ত্রুটি, গোপনতম লজ্জার কথা, পাপবোধ, ঘৃণা আর ঈর্ষার কথা প্রকাশ করছে, নির্বিকার শুনছেন চিকিৎসক; বিস্ময় নেই, আঁতকে ওঠা নেই, নৈতিক বিচারে ছোট বা বড় করা নেই। নিজেকে নিশ্চিন্তে মেলে ধরতে পারছে রোগী, এবং যখন দেখছে এতসব দোষত্রুটি সত্ত্বেও মানুষ হিসেবে গ্রহণযোগ্যই থাকছে সে আরেকজনের কাছে, তখন নিজেকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হচ্ছে তার নিজের কাছেও। এটাই সেরে ওঠার দিকে তার প্রথম পদক্ষেপ।

সমর্থন

সমর্থন ও স্বীকৃতি আমাদের সবার দরকার। দোষ-ক্রুটিসহ যে যেমন তাকে সেইভাবে মেনে নেয়ার কথা এতক্ষণ যা বললাম, তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হলেও একটা নেতিবাচক ভাব রয়েছে। দোষটাকেও সহ্য করে নেয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু স্বীকৃতি ও সমর্থন হচ্ছে পুরোপুরি ইতিবাচক ব্যাপার। মেনে নেয়ার সাথে পছন্দ করার যে তফাৎ, গ্রহণের সাথে সমর্থনের ঠিক ততটাই পার্থক্য।

প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে খুঁজলে কিছু না কিছু পাওয়া যাবে যা আমরা পছন্দ করতে পারি, তেমনি অপছন্দ করবার মতও কিছু না কিছু খুঁজে বের করা যাবেই। কি খুঁজছেন তার উপর নির্ভর করছে আপনার পাওয়া। আপনি যদি নেতিবাচক চরিত্রের লোক হন, মানুষের দোষক্রুটি বেশি করে চোখে পড়বে আপনার, তাকে অপছন্দ করবার অনেক কারণ খুঁজে পাবেন অতি সহজেই। আর যদি ইতিবাচক চরিত্রের লোক হন, মানুষের ভালটা চোখে পড়বে আপনার চট করে, অনেক কিছু পেয়ে যাবেন তার মধ্যে যা আপনার পছন্দ হয়।

নেতিবাচক লোকের সংস্পর্শে এলে তার প্রভাবে আমাদের চরিত্রের খারাপ দিকগুলো ফুটে ওঠে বেশি করে, কারণ সে খারাপটাই কেবল লক্ষ করছে, অপছন্দ করছে। আর ইতিবাচক লোকের সংস্পর্শে এলে তার প্রভাবে আমরা আমাদের চরিত্রের ভাল দিকগুলো প্রকাশ করি, কারণ জানি সে আমাদের ভাল গুণগুলো দেখতে পাচ্ছে, পছন্দ করছে। তাদের পছন্দ ও সমর্থন আমাদের আরও ভাল কিছু করবার জন্যে অনুপ্রাণিত করছে।

নেতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করলে আমাদের বা অন্যের কোন উপকার হয় না কখনও। কাজেই মানুষের সাথে মিশতে গিয়ে আমরা এই ভূমিকাটা বর্জন করবার চেষ্টা করব। তারমধ্যে ভালটা খুঁজব, চেষ্টা করব যাতে তাকে পছন্দ করতে পারি। কারও মধ্যে কিছু একটা ভাল পেলে আমাদের পছন্দ বা সমর্থনের কথা তাকে জানাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা কার্পণ্য করব না।

তবে একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার। পছন্দ, সমর্থন বা স্বীকৃতির কথা জানাবার জন্যে বিরাট কোন গুণ আবিষ্কারের কোন প্রয়োজন নেই। একজন সুগায়ককে যদি জানান তার কণ্ঠ আপনার খুব ভাল লাগে, তেমন কিছুই এসে যাবে না তার—হয়তো চাটুকারিতা হিসেবে গ্রহণ করবে সে আপনার কথা, কারণ তার কণ্ঠ যে মানুষের ভাল লাগে সেটা ভাল করেই জানে সে, এটা প্রমাণিত সত্য, নইলে সুগায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই সম্ভব হত না তার পক্ষে। কিন্তু আপনি যদি এই শিল্পীর ছোটখাট অন্য কোন সমর্থনযোগ্য দিক আবিষ্কার করতে পারেন এবং সেই গুণের প্রশংসা করতে পারেন, দেখবেন খুশি উপচে পড়ছে তার চোখ-মুখ থেকে। এই শিল্পীর হাতের লেখাটা ভাল হতে পারে, জামা-কাপড়ে সুরুচির পরিচয় থাকতে পারে, এমন কি বলা যায় না, হয়তো সুজির হালুয়া তৈরিতে তার জুড়ি নেই। কেবল এই ক'টিই নয়, আরও অসংখ্য গুণ রয়েছে তার—খুঁজে বের করুন সেসব, আপনার সমর্থন বা স্বীকৃতির কথা জানান, আপনার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা

থাকবে তার বন্ধুর তালিকায়।

এদেশের বীমা-জাদুকর হিসেবে খ্যাত খোদাবক্স সাহেব যখন ঈস্টার্ন ফেডারেল ইনশিওরেন্স কোম্পানীর কর্ণধার, তখন একবার তাঁর সাথে পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল। ভদ্রলোক খুবই ব্যস্ত ছিলেন, বেরিয়ে যাচ্ছিলেন অফিস থেকে, আমার কপালে দুটো টোকা দিয়ে বললেন: ইন্টেলিজেন্ট ফোরহেড। তারপর ত্রস্ত পায়ে চলে গেলেন নিজের কাজে। বারো বছর হয়ে গেছে, এখনও ভুলতে পারি না কেন কথাটা? কারণ, সত্য হোক বা মিথ্যে হোক, কথাটা মনে ধরেছিল। সেই সময় আমি মোটামুটি প্রসিদ্ধ এক কণ্ঠশিল্পী ছিলাম, লেখাও ধরেছি অল্পস্বল্প, আমার পিতার সাথেও ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছিলেন খোদাবক্স সাহেব। সব পরিচয়ই তাঁর জানা। কিন্তু সেসবের ধার দিয়ে না গিয়ে তিনি টোকা দিলেন এমন এক জায়গায় যে আজও কৃতজ্ঞ হয়ে আছি আমি মরহুম খোদাবক্স সাহেবের কাছে।

প্রশংসা

মানুষ মাত্রেই প্রশংসা (চাটুকারিতা নয়) ভালবাসে। প্রশংসা জিনিসটা আর কিছুই নয়—মানুষকে যথাযথ ভাবে তার প্রাপ্য মূল্য দেয়া। একটু খতিয়ে দেখুন, আপনার স্ত্রী বা স্বামী, ছেলে বা মেয়ে, মা-বাপ, বন্ধু, সহকর্মী, আপনার বস্ বা কর্মচারী, আপনার খরিদ্দার—সবাই আপনার কাছে কতখানি মূল্যবান, এদের সত্যিকার মূল্য যদি মনের মধ্যে গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে পারেন, তাহলে তাদের যে মূল্য দেন সেই কথাটা ছোটখাট নানান উপায়ে জানিয়ে দেয়া মোটেই কঠিন কাজ হবে না। এই জানানোর নামই প্রশংসা। কার্পণ্য করতে যাবেন না। অকাতরে প্রশংসা করুন সবার। এই জিনিসটা 'যতই করিবে দান, তত যাবে বেড়ে'। আপনার আশেপাশে মৌমাছির মত ভিড় করবে মানুষ।

এ ব্যাপারে দুটো কথা শুধু মনে রাখা দরকার। প্রত্যেকটি মানুষই বিশিষ্ট। ঢালাও কারবার চলবে না—বিশেষভাবে মূল্য দিতে হবে প্রত্যেকের বিশেষ গুণকে। সৎভাবে। সৎ প্রশংসা যত সামান্য ব্যাপারের জন্যেই হোক না কেন শ্রোতার কানে মধু ঢালবে। চাটুকারিতায় বক্তা বা শ্রোতা শেষ পর্যন্ত কারোই কোন উপকার হয় না। কোন মহিলার চোখ দুটো সুন্দর হলে কেবল চোখেরই প্রশংসা করুন, খুশি হবে। তাকে বিশ্বের সেরা সুন্দরী বলার কোন দরকার নেই। আর একটি কথা হচ্ছে: সরাসরি ব্যক্তিকে প্রশংসা না করে তার কাজ বা গুণের প্রশংসা করুন। যেমন ধরুন, 'কচি, টেবিল-টেনিসে তোমার তুলনা হয় না' না বলে বলুন, 'তোমার খেলার স্টাইল আমার সবচেয়ে ভাল লাগে।' 'জসিম, আপনি সত্যিই সুপুরুষ' না বলে বলুন, 'ঝাঁকড়া চুলে চমৎকার মানিয়েছে আপনাকে।' 'আপনি খুব ভাল ডাক্তার' না বলে বলুন, 'আপনার চিকিৎসায় চমৎকার কাজ হয়েছে, ডাক্তার সাহেব।'

কোন কাজ বা গুণের প্রশংসা করার সুবিধে এই যে, ঠিক কেন প্রশংসা করা হচ্ছে সেটা নির্দিষ্টভাবে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। 'আপনার তুলনা হয় না' বললে কিছুই পরিষ্কার বোঝা যায় না। এর ফলে শ্রোতা লজ্জায় লাল হয়ে উঠবে। কিন্তু গুণের

প্রশংসা যদি আপনি সবার সামনেও করেন কেউ সেটাকে পক্ষপাতিত্ব বা চাটুকারিতা বলে মনে করবে না, যাকে বলেছেন সে-ও আড়ষ্ট বোধ করবে না। কাজ বা গুণের প্রশংসা পেলে সেই কাজ বা গুণ আরও বাড়িয়ে তোলার আগ্রহ সৃষ্টি হয় শ্রোতার মধ্যে। কাজের প্রশংসা করুন, বেড়ে যাবে কাজের পরিমাণ; ব্যবহারের প্রশংসা করুন, আরও ভদ্র হবে শ্রোতার ব্যবহার; গুণের প্রশংসা করুন আরও গুণী হয়ে উঠবে সে। কিন্তু শুধু ব্যক্তিকে প্রশংসা করলে তার মাথাটা খাওয়া ছাড়া আর কোন লাভ হয় না, আত্মম্ভরিতা এসে যায় তার মধ্যে। ছেলেকে যদি বলেন: তুমি খুব ভাল ছেলে, তোমার তুলনা হয় না—তার মাথাটা খাওয়া হয়। কারণ, কি ভাল, কেন ভাল, কতটা ভাল, কিছুই বুঝতে পারছে না সে। কিন্তু ভাল কোন কাজ বা গুণের প্রশংসা করুন, দ্রুত উন্নতি হবে তার। আরও অনেক পরিশ্রম করবে সে সেই গুণের বিকাশ ঘটাতে।

বাক-চাতুরী

ইয়োর লাইফ' ম্যাগাজিনের এডিটোরিয়াল ডিরেক্টর উইলফ্রেড ফাংক একবার স্থির করলেন, জীবনে যারা সাফল্য অর্জন করেছে সেইসব লোকদের মধ্যে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে মিল পাওয়া যায় কিনা গবেষণা করে দেখা দরকার। যদি দেখা যায় কোন বিশেষ গুণ সবার মধ্যেই বর্তমান, তাহলে হয়তো আবিষ্কার করা যেতে পারে সাফল্যের চাবিকাঠি।

যেমন ভাবনা তেমনি কাজ। কয়েক হাজার নারী-পুরুষ বাছাই করা হলো যাঁরা তাঁদের নিজস্ব বিশেষ ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক উন্নতি করেছেন। নানান জনের নানান গুণ। কিন্তু একটি ব্যাপারে এসে একেবারে তাজ্জব হয়ে গেলেন ফাংক। একটি বিষয়ে সবার মধ্যেই আশ্চর্য মিল পাওয়া যাচ্ছে। এদের প্রত্যেকে বাক-পটু। প্রত্যেকটি লোকই ভাষা ব্যবহারে বিশেষ ভাবে দক্ষ। দেখে শুনে তিনি বলেই বসলেন: জীবনে উন্নতি করতে হলে বাক-পটু হতে হবে তোমাকে। ভাষার উপর কার কতটা দখল রয়েছে তার উপর নির্ভর করবে কে কতটা উন্নতি করবে, কত বেশি উপার্জন করবে।

আমরা অনেক সময় ঠাট্টাচ্ছলে বলি: টিকে আছিস তো শুধু মুখের জোরে—মুখ না থাকলে কবে তোকে পিঁপড়েয় টেনে নিয়ে যেত। কথাটা কিন্তু একেবারে বাজে কথা নয়। আর কিচ্ছু নেই, শুধু মুখ চালিয়ে কথার জোরে টিকে আছে এমন লোক প্রচুর রয়েছে আমাদের আশেপাশেই।

শুধু উপার্জন বা উন্নতিই নয়, আপনার সুখ-শান্তিও অনেকাংশে নির্ভর করে কথার মাধ্যমে আপনার মনের ভাব প্রকাশের ক্ষমতার উপর। মানুষকে মনের ভাব প্রকাশ করতেই হবে। এর সবচেয়ে সহজ ও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে কথা। কথার মাধ্যমেই অপরকে জানাতে হবে আপনার ধ্যান-ধারণা, ইচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্য, অসুবিধে বা হতাশার কথা। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, বেশির ভাগ অসুখী মানুষ নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না বলেই অসুখী—চিন্তা, ধ্যান-ধারণা ও ভাবাবেগ নিজের মধ্যে ছিপি আঁটা থাকে বলে কিছুতেই সুখি হতে পারে না তারা।

কাজেই কথার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে উপযুক্ত গুরুত্বের সাথে আলোচনা হওয়া দরকার।

কিভাবে শুরু করব

আসল গোলমাল কিন্তু এখানটাতেই। কথা কিভাবে শুরু করা যায় সেটাই বেশির ভাগ মানুষের মূল সমস্যা। অনেক মজার কথাই হয়তো রয়েছে আপনার পেটে, একবার শুরু হয়ে গেলে অনায়াসে মুগ্ধ করতে পারবেন শ্রোতাকে, কিন্তু শুরুটা

করতে জানেন না বলে মুখ বুজে থাকতে হচ্ছে আপনাকে। আপনি হয়তো মনে করছেন মানব চরিত্র বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে মহা পাণ্ডিত্যপূর্ণ কিছু না বলতে পারলে সবাই বোকা মনে করবে আপনাকে। অথচ হুট করে বুদ্ধিদীপ্ত কোন কথা আসছেও না মাথায়। 'এইরে, আবার বৃষ্টি আসছে চেপে!' বললে তো আর নতুন কিছু বলা হলো না। উইলিয়াম জেমস বলছেন, 'কথাবার্তা শুরু করতে মানুষ অসুবিধে বোধ করে সাদামাঠা কোন কথা দিয়ে শুরু করতে চায় না বলেই।' তাঁর সমাধান হচ্ছে: মনের ব্রেক চেপে না রেখে যা মুখে আসে বলে যান সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে।

'নির্ভুল হতেই হবে, তার কোন মানে নেই,' বলছেন জন ডি মারফি। 'কথাবার্তায় নির্ভুল হওয়ার চেষ্টা বাদ দিন। সচেতনভাবে চেষ্টা করে প্রখর বা ঝলমলে কোন মন্তব্য করা খুবই কষ্টসাধ্য কাজ। চেষ্টা বাদ দিলেই কথা বলতে বলতে মুখ দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ আশ্চর্য সব তীক্ষ্ণ, বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য বেরিয়ে আসবে আপনিই··· প্রতিটা বাক্যেই প্রতিভার ছাপ আসলে কেউ আশা করে না আমাদের কাছে। সেক্সপীয়রের যে কোন বই ঘেঁটে দেখুন, বা যে কোন ক্লাসিক রচনার পাতা উল্টে দেখুন, প্রচুর কথা রয়েছে যা নেহায়েতই সাদামাঠা, আটপৌরে।'

ঠিক। প্রথম দিকে আলোচনা জমে না ওঠা পর্যন্ত প্রচুর সাদামাঠা কথা বলতে হবে আপনার। 'তাই নাকি?' 'বাহ্!' 'সত্যিই?' 'যা বলেছেন!'—এই জাতীয় মন্তব্য জমজমাট আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে খুবই সাহায্য করে। মানুষের সাথে আলাপ-আলোচনা অনেকটা স্বর্ণখনি খোঁড়ার মত ব্যাপার। শুরুতেই চব্বিশ ক্যারেট সোনা আশা করলে পাবেন না আপনি। গোড়াতে প্রচুর মাটি আর পাথরের সাথে সামান্য সোনা উঠবে—এটা মেনে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে আপনাকে—যতই গভীরে যাবেন ততই বাড়বে খাঁটি সোনার পরিমাণ।

কাজেই সাদামাঠা কথা বলতে কক্ষনো ভয় পাবেন না। সহজ ভাবে শুরু করুন, দেখবেন অপরিচিত কারও সাথে কথা বলতেও অসুবিধে হচ্ছে না আর। কিছুদূর এগোলে নিজেই অবাক হয়ে যাবেন নিজের মুখ থেকে বেরোনো কথার দীপ্তি দেখে। জমে ওঠার জন্যে কিছুটা সময় ব্যয় করতেই হবে আপনার। টিভিতে কারও ইন্টারভিউ দেখতে গিয়ে লক্ষ করবেন, প্রশ্নকর্তা প্রথমেই ঝপ্ করে কোন তত্ত্বালোচনায় নামছেন না, সাদামাঠা প্রশ্ন করে প্রথমে সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠার সুযোগ দিচ্ছেন নিমন্ত্রিত ব্যক্তিটিকে। 'আপনার নামটা কি, জনাব? বাড়ি কোথায়? কি করেন? ছেলেমেয়ে কয়টা? সংসারে আর কে কে আছেন? কতদিন হলো ঢাকায় এসেছেন? কি কাজে এসেছেন? কতদিন আছেন?'

এসব কথার কোন অর্থ হয়?—জিজ্ঞেস করতে পারেন আপনি। এসব আসলেই একেবারে বাজে প্রশ্ন, বুদ্ধির ছিটেফোঁটাও নেই কোথাও। কিন্তু কথাবার্তা শুরু করতে হলে এসব অপরিহার্য। কারও মুখ থেকে মজার কিছু কথা বের করতে হলে তাকে গরম করে নিতে হবে আগে। কেবল প্রশ্নই নয়, উত্তর শুনে প্রশ্নকর্তা যেসব মন্তব্য করছেন, লক্ষ করুন। বাড়ি দিনাজপুর শুনে বলছেন, 'ও বাবা, বহুদূর।' আট ছেলেমেয়ে শুনে বলছেন, 'শাব্বাশ্।' মা-বাবা বেঁচে আছেন শুনে বলছেন, 'বেশ, ভাল।'—এসব কথারও কোন অর্থ হয় না।

কিন্তু এই যে প্রশ্নকর্তা, তিনি রীতিমত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষিত একজন এক্সপার্ট। ভাল বেতন বা পারিশ্রমিক দিয়ে নিযুক্ত করা হয়েছে এঁকে এই কাজের জন্যে। ইনি জানেন, এইসব সাদামাঠা প্রশ্ন ও মন্তব্য দিয়ে আলোচনাটাকে একটু তাতিয়ে না নিলে মজার বা নতুন কিছু টেনে বের করা যায় না অন্যের মধ্যে থেকে। এঁরা যদি সাদামাঠা প্রশ্ন ও মন্তব্যকে নির্বুদ্ধিতা মনে না করেন, এঁরাও যদি শুরুতেই জমজমাট আলাপের সূত্রপাত করতে না পারেন—আমি-আপনি পারব কি করে?

কি বলব

কি বলব, এই ভেবে অনেক সময় চুপ করে থাকি আমরা। আলোচনা তো আর এক তরফা হয় না। অপরিচিত এক ভদ্রলোক, কে বা কি কিছুই জানি না, কি প্রশ্ন করতে কি জিজ্ঞেস করে বসব, হয়তো বিব্রতই করা হবে তাকে—এই সব সাত-পাঁচ ভাবি। আসলে সমাধানটা খুবই সহজ। তাকে তার নিজের সম্পর্কে প্রশ্ন করুন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, এই একটি বিষয়ে যেকোন মানুষ দারুণ আগ্রহী, এই একটি বিষয়ে প্রচুর জ্ঞান রাখে সবাই।

নিজের ব্যাপারে সবাই আগ্রহী। নিজের কাজ, নিজের পরিবার, নিজের দেশ, নিজের মতবাদ মানুষের কাছে সবচেয়ে প্রিয়। আপনি কাউকে তার বিষয়ে প্রশ্ন করলে শতদলের মত পাপড়ি মেলবে সে, চাই কি আপনার সম্পর্কেও দু'একটা কথা জানবার আগ্রহ সৃষ্টি হবে তার মধ্যে। সে যদি প্রশ্ন করে, আপনার সম্পর্কে কিছু জানতে চায়, অল্প কথায় উত্তর দিন, উত্তর এড়িয়ে যাওয়া পছন্দ করে না মানুষ। কিন্তু খেয়াল রাখবেন, আলোচনাটা যত বেশিক্ষণ নিজের দিকে টেনে রাখবেন ততই ভাটা পড়বে অন্যের আগ্রহে। চট করে ফিরে যেতে হবে আপনার তারই প্রসঙ্গে। আপনিও মানুষ, আপনারও নিজের সম্পর্কে গড়গড় করে প্রচুর কথা বলতে মন চাইবে, কিন্তু এই জায়গায় নিজেকে একটু সামলে রাখতে হবে আপনার।

তাই বলে সেই তরুণ কবির মত পুরো একটি ঘণ্টা নিজের কবিতা সম্পর্কে বকবক করে শেষে বলবেন না, 'হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে আমার নিজের কথা। এবার আপনার কথা শোনা যাক। বলুন দেখি, আমার কবিতা সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?'

হাসিখুশি

কথায় বার্তায় যতটা সম্ভব হাসি খুশি ভাব থাকা দরকার। গোমড়া মুখো ভূত কেউ পছন্দ করে না। সর্বনাশের দূতকে মানুষের আরও অপছন্দ। দুঃসংবাদ শুনতে ভাল লাগে না কারও।

বলতে দিন

কথার মধ্যে কাউকে বাধা দেবেন না, কিন্তু নিজের সম্মতি বা সমর্থন জানাতে দ্বিধা করবেন না মোটেও। কেউ যদি বলে: আমি গ্রামের ছেলে, সাথে সাথেই মাথা ঝাঁকিয়ে বলুন: আমিও (যদি তাই হন)। যদি বলে: রাতে রুটি খাই আমি, বলুন:

আমিও (যদি তাই হয়)। এর ফলে শ্রোতা ও বক্তার মধ্যে খুব দ্রুত গড়ে ওঠে সহজ সম্পর্ক। অন্যভাবে আপনি তাকে জানাচ্ছেন: আপনিও তারই মত, আপনি তার মতামত সমর্থন করেন, সে যা পছন্দ করে আপনিও তাই পছন্দ করেন। নিজের সাথে যাদের মিল রয়েছে আমরা তাদের পছন্দ করি, অমিল বা গরমিল অপছন্দ করি আমরা সবাই। যে আমাদের মত নয়, তাকে আমরা আত্মপ্রেমের প্রতি প্রত্যক্ষ হুমকি বলে মনে করি। যার সাথে মিল খুঁজে পাই, তাকে আপন মনে হয়, সে আমাদের আত্মপ্রেমের মাত্রা বাড়িয়ে তোলে।

দ্বিমত

যদি কোন ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন, এবং সেটা তাকে জানানো অপরিহার্য হয়; আগে ছোটখাট কয়েকটি বিষয়ে মিল খুঁজে নেয়া ভাল। যত ছোটই হোক, কয়েকটা বিষয়ে যদি একমত হতে পারেন, তাহলে দু'জন দুই মত নিয়েও স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পারবেন সহজেই।

ব্যক্তিগত সমস্যা

আলোচনার মধ্যে ব্যক্তিগত সমস্যার উল্লেখ যতটা সম্ভব এড়িয়ে যাওয়াই ভাল। এসব শুনতে কারও ভাল লাগে না। এসব যদি কখনও খুব বেশি কষ্ট দেয়, মানুষকে বলার চেয়ে ডায়েরীতে লিখে ফেলা অনেক ভাল। মনের যত ক্ষোভ, হতাশা, বিরক্তি ঝেড়ে লিখুন ডায়েরীতে, ভাষাটাকেও ভদ্রোচিত করবার দরকার নেই, প্রতিপক্ষকে গালি দিতে ইচ্ছে করলে মনের আনন্দে দিন যত খুশি। যা মনে আসে লিখে ফেলুন। প্রয়োজন হলে একাধিকবার। প্রকাশের পথ পেয়ে হালকা হয়ে যাবে মনটা, মানুষকে এ নিয়ে আর জ্বালাতন করবার ইচ্ছেই থাকবে না।

মস্করা

সবশেষে একটা কথা না বললে আলোচনা সম্পূর্ণ হবে না। কথায় বার্তায় কাউকে নিয়ে মস্করা করা, বক্রোক্তি করা, ইত্যাদি থেকে বিরত রাখতে হবে আপনার নিজেকে। আমরা বাঁকা কথা বা মস্করার মাধ্যমে নিজেকে খুব চালাকচতুর বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করি। আশা করি, আমাদের রসিকতা বা বুদ্ধিমত্তা মুগ্ধ করবে মানুষকে, যাকে হাস্যাস্পদ করা হচ্ছে সে-ও রসিকতাটা বুঝবে, কিছু মনে করবে না। আসলে ঘটে কিন্তু উল্টোটা। আপনার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুও, সামনা-সামনি হাসির মত ভঙ্গি করলেও, মনে মনে চোট পাবে যদি তাকে নিয়ে তামাশা করেন। কারণ, এসবের পিছনে আপাতদৃষ্টিতে মজা মজা একটা ভাব থাকলেও, উদ্দেশ্য অপরকে হেয় করা। এটা কারোই ভাল লাগতে পারে না। আত্মপ্রেমের এলাকায় হামলা, বা অহমের প্রতি হুমকি মানুষের সবচেয়ে বেশি অপছন্দ।

আশাকরি এই সব তথ্য আপনাকে বাক-পটুত্ব অর্জন করতে সাহায্য করবে। আশাকরি অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারবেন আপনি নিজেকে মানুষের কাছে।

মতবিরোধ

প্রায় প্রতিদিনই আমাদের জীবনে এমন কিছু না কিছু অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন মানুষকে দিয়ে আমাদের মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করানো প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ছোট-বড় নানান ধরনের মতবিরোধের মোকাবিলা করতে হয় আমাদের, বোঝাতে হয় স্বামী-স্ত্রী-সন্তান, সহকর্মী, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, প্রতিবেশী, ক্রেতা, বন্ধু বা শত্রুকে। কিন্তু মানুষকে কিছু বোঝানো বড় মুশকিল। প্রায় শোনা যায় আক্ষেপবাণী: কিছুতেই বোঝানো গেল না লোকটাকে।

আপনার হয়তো ইচ্ছে ছেলেটাকে বাংলা মিডিয়ামে পড়াবেন, আপনার স্ত্রী গোঁ ধরে বসলেন না, ইংলিশ মিডিয়ামে পড়বে ছেলে। আপনি হয়তো মনে করেন এবার আপনার বেতন বাড়া দরকার, কোম্পানী বুঝতে চায় না সেকথা। আপনি হয়তো রেডিমেড কাপড়ের বিক্রেতা, স্বামীর জন্যে শার্ট কিনে নিয়ে গিয়েছিলেন এক ভদ্রমহিলা, ফেরত নিয়ে এসেছেন এখন—স্বামীর পছন্দ হয়নি। তিনি বলছেন ব্যবহার করা তো দূরের কথা ভাঁজই খোলা হয়নি শার্টের, অথচ আপনি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন লণ্ড্রির চিহ্ন। হয়তো এক বছরের গ্যারান্টি দিয়ে মেশিন বিক্রি করেছিলেন, সময়সীমা পেরিয়ে যাবার একমাস পর ভাঙা মেশিন নিয়ে খরিদ্দার হাজির। তার বক্তব্য: দু'মাস আগেই নষ্ট হয়েছে মেশিন, ব্র্যান্ড-নিউ মেশিন দিয়ে রিপ্লেস করতে হবে। বোঝানো যাচ্ছে না কিছুতেই। হয় না এই রকম? তর্ক করে মুখ দিয়ে ফেনা তুলে ফেললেও কিছুতেই বোঝানো যায় না মানুষকে।

স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া

মতবিরোধ দেখা দিলেই আমাদের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তর্ক জুড়ে দেয়া। কোন্ টীম ভাল খেলেছে, মোহামেডান স্পোর্টিং বা আবাহনী, তাই নিয়ে তর্ক। সমুদ্রসীমা নিয়ে তর্ক, আন্তর্জাতিক নদী নিয়ে তর্ক, বর্ণবৈষম্য নিয়ে তর্ক। তর্কই আমাদের প্রধান অস্ত্র।

কেউ কোন ব্যাপারে আমাদের বিরোধিতা করলেই আমাদের মধ্যে ছলে-বলে-কৌশলে তাকে দমন করবার প্রবণতা এসে যায়। এটাই স্বাভাবিক। বিরোধিতাকে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত 'অহমে'র উপর হামলা বলে মনে করি। সাথে সাথেই একটা আক্রমণাত্মক ভাব এসে উপস্থিত হয়। স্বভাবতঃই ভাবাবেগে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। প্রতিপক্ষের 'অহম' এর উপর আঘাত হানবার চেষ্টা করি, চিৎকার করি, ভয় দেখাই, লজ্জা দেয়ার চেষ্টা করি, অপমান করি। তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে চেষ্টা করি আমাদের মতাদর্শ জোর করে তার মুখে পুরে লাঠি দিয়ে গুঁতিয়ে পেটে ভরতে। আমাদের প্রতিটা যুক্তি বা দাবিকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, অনেক বেশি মূল্যবান এবং প্রতিপক্ষেরগুলোকে একেবারেই মূল্যহীন প্রমাণ করবার

আপ্রাণ চেষ্টা করি। অথচ আমরা সবাই জানি, এই রকম জোর জবরদস্তি করে কারও মত পরিবর্তন করা আসলে যায় না। আসল দরকার তার মধ্যে স্বেচ্ছায় মত পরিবর্তন করবার মত অবস্থা তৈরি করা।

কাজেই বিরোধিতার মুখে আমাদের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াকে দমন করে কিছুটা বুদ্ধি খরচ করবার প্রয়োজন রয়েছে।

বৈজ্ঞানিক উপায়

তর্কাতর্কি, ঝাঁঝাল বক্তৃতা বা প্রতিপক্ষের অহমের উপর আক্রমণ চালিয়ে তার মত পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। চার আর তিনে সাত হয় এই সহজ অঙ্কটা আমি যদি বুঝতে না চাই, কারও সাধ্য আছে আমাকে বোঝায়?

কারও মত পরিবর্তন করে আমাদের অনুকূলে আনতে হলে স্বাভাবিক ভাবে যা করতে ইচ্ছে হয়, আমাদের করতে হবে ঠিক তার উল্টোটা। এ ব্যাপারে আমাদের দেশে খুব একটা গবেষণা বা চর্চা হয়নি বলে ভুল রয়ে গেছে আমাদের মধ্যে। জন্ম-নিয়ন্ত্রণ, সবুজ বিপ্লব, স্বনির্ভর কর্মসূচী, ইত্যাদি বড় বড় প্রজেক্ট, যেখানে জনসাধারণের মত পরিবর্তন করবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, সে সব ক্ষেত্রে প্রচুর অর্থ ব্যয় সত্ত্বেও আমরা তেমন সফল হতে পারিনি। যে ভুলটা আমি-আপনি ঘরোয়া-রাজনীতি বা ফুটবল-সিনেমা নিয়ে তর্ক করতে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই করি, ঠিক সেই একই ভুল একটু লক্ষ্য করলেই আপনার চোখে পড়বে বড় বড় অর্গানাইজেশনের প্রচার-পুস্তিকা, স্লোগান ও বিজ্ঞাপনে।

১৯৫৪ সালের মার্চ সংখ্যায় সাইন্স ডাইজেস্ট পত্রিকা প্রশ্ন তুলেছিল: সিভিল ডিফেন্স প্রোগ্রাম বা ক্যানসার প্রতিরোধ প্রচারণা আমেরিকান জনসাধারণের মধ্যে আশানুরূপ সাড়া জাগাতে পারছে না কেন? নাটকীয় সাবধান বাণী, ভয়াবহ দৃষ্টান্তমূলক ফিচার ফিল্ম, চমৎকার পোস্টার, কোনটাতেই তেমন কাজ হচ্ছে না। কারণটা কি?

এর উত্তর পাওয়া গেল ইয়েলের তিনজন মনোবিজ্ঞানী কার্ল আই. হোমল্যান্ড, আর্ভিং এল. জেনিস ও হ্যারল্ড এইচ. কেলির গবেষণা থেকে। তাঁরা বললেন, হুমকি বা ভয় দেখিয়ে মানুষের মতবাদ বা অভ্যাস পরিবর্তন করা খুবই কঠিন। কাজ হাসিল করতে হলে চাই মৃদু চাপ।

মৃদু চাপ

মৃদু চাপ বলতে এঁরা বলতে চাইছেন কোন রকম নাটকীয়তার মধ্যে না গিয়ে, ভীতি প্রদর্শন না করে, বলপ্রয়োগের হুমকি না দিয়ে সহজ ভাবে তথ্যগুলো তুলে ধরা।

পঁচিশ ধরনের পঁচিশটা এক্সপেরিমেন্ট করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তিন মনোবিজ্ঞানী। একটির বর্ণনা তুলে দিচ্ছি এখানে।

কোন রকম ভাল বা মন্দের বাছ-বিচার না করে সাদামাঠা তিনটি দলে ভাগ করা হলো ছাত্রদের। পৃথক ভাবে প্রত্যেকটি দলের সামনে দাঁতের পরিচর্যার উপর পনেরো মিনিটের জন্যে বক্তৃতা ও ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হলো। প্রথম দলের সামনে অত্যন্ত জোরাল এবং নাটকীয় ভাবে উপস্থাপনা করা হলো দাঁতের ক্ষয়,

মাড়ির ঘা, ক্যানসার, ইত্যাদির ভয়াবহতা। জানানো হলো অবহেলা করলে কি মারাত্মক পরিণতি হতে পারে, সেই সাথে এসব থেকে বাঁচতে হলে স্বাস্থ্যসম্মত পরিচর্যার কি কি উপায়।

দ্বিতীয় দলের সামনে বক্তব্যটা বেশ অনেকখানি মোলায়েম করে পেশ করা হলো। বিপদের কথা বলা হলো ঠিকই, কিন্তু নাটকীয়তা কমিয়ে কিছুটা জোর দেয়া হলো তথ্যের উপর।

আর তৃতীয় দলের সামনে তুলে ধরা হলো কেবল সাদামাঠা তথ্য, বিপদ বা ভয়াবহ পরিণামের দিকটা উহ্য রেখে।

এক সপ্তাহ পর পরীক্ষা করে দেখা হলো এই পনেরো মিনিট বক্তৃতার ফলে কোন্ দলের কতটা কি পরিবর্তন হয়েছে। দেখা গেল, তৃতীয় দল, অর্থাৎ যাদের উপর সবচেয়ে মৃদু চাপ দেয়া হয়েছিল, ভীতি প্রদর্শনের কোন চেষ্টা করা হয়নি, তারাই দন্ত পরিচর্যার নিয়ম কানুন সবচেয়ে বেশি মেনে চলছে। দ্বিতীয় দলের অল্প কয়েকজন কমবেশি দাঁতের যত্ন নিচ্ছে। কিন্তু প্রথম দলের কারও উপরই তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি বক্তৃতা।

রাজনৈতিক মতাদর্শ পরিবর্তনের ব্যাপারেও পরীক্ষা করে এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা গেছে। বড় বড় বোল চালের মাধ্যমে মুগ্ধ করবার চেষ্টা না করে যে দল সাদামাঠা ভাবাবেগ বর্জিত তথ্য তুলে ধরতে পেরেছে সেই দিকেই ভিড়েছে বেশির ভাগ ছাত্র। কথাটা বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতারা স্মরণ রাখলে উপকৃত হবেন।

মোদ্দা কথা, মানুষের প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে তাকে স্ব-মতে আনা সম্ভব নয়। কাজ করতে হবে মানবপ্রকৃতির গতিধারার অনুকূলে।

কাউকে যদি বলেন তার ধারণা ভুল বা তার বক্তব্য নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক, যতক্ষণ দম আছে তর্ক করে যাবে সে তার ধারণার স্বপক্ষে। তাকে হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করুন, প্রাণপণ চেষ্টা করবে সে নিজের পজিশন ঠিক রাখবার জন্যে। তাকে হুমকি দিন, ধমক দিন, ভয় দেখান—মনের জানালার কপাট আটকে দেবে সে, যত ভাল ভাল কথাই বলুন না কেন, কিচ্ছু শুনবে না, কিছুতেই গ্রহণ করবে না আপনার মতবাদ।

আত্মরক্ষার প্রবণতা মানুষের একটা অন্যতম জোরাল সহজাত প্রবৃত্তি। টিকে থাকতে হবে তাকে। 'আত্ম' বলতে শুধু শরীরটাকেই বোঝায় না, নিজের অহমটাকেও টিকিয়ে রাখতে হবে। আসলে আত্মরক্ষার খাতিরেই কোন্ মতবাদ গ্রহণ করব, কিভাবে চলব, ইত্যাদি ব্যাপারে আমাদের এত সাবধানতা। যেসব ধ্যান-ধারণাকে শত্রু-ভাবাপন্ন বলে মনে হয় সেসব এড়িয়ে যাওয়া অভ্যাস করেছি আমরা শিশুকাল থেকেই। জাজ্জ্বল্যমান কোন ভীতিপ্রদ সত্যের সম্মুখীন হলেই আমরা চোখ-কান বুজে পাশ কাটিয়ে সরে যেতে চাই দূরে।

অবচেতন বর্জন

বিরোধিতা দূর করে কাউকে স্বমতে আনতে হলে তার অবচেতন মনের কাছে

পৌঁছতে হবে আপনাকে। কারণ, যুক্তি তর্কের সাহায্যে মানুষের সচেতন মনকে রাজি করালেও তাকে দিয়ে কোনো কাজ করাতে পারবেন না, যতক্ষণ তার অবচেতন মন আপনার কথাগুলো মেনে না নিচ্ছে। এই লোক মুখে মুখে হয়তো আপনাকে সমর্থন করে যাবে, ভাব দেখাবে যেন আপনার কথা মেনে নিয়েছে, কিন্তু প্রকৃত কার্যক্ষেত্রে দেখবেন কাজ করে বসেছে ঠিক উল্টোটা। এইজন্যেই সমাজতন্ত্র প্রবর্তন ও মেনে নেয়ার এত বৎসর পরও গণচীনে হঠাৎ করে মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যাচ্ছে এক-একজন বিশ্বাসঘাতকের, প্রয়োজন পড়ছে পরিবর্তনের।

কাজেই আপনার পৌঁছতে হবে চেতন মনের বেড়া ডিঙিয়ে মানুষের অবচেতন মনে। মানুষের অবচেতন মনকে দিয়ে কোন কিছু গ্রহণ করাতে হলে, মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, একমাত্র উপায় হচ্ছে 'সাজেশন'। অসংখ্য এক্স্পেরিমেন্ট করে দেখা গেছে, জোরাল যুক্তিতর্কের অবতারণা করে যত বেশি জোর খাটানো যাবে, ততই প্রবল হবে অবচেতন মনের প্রতিরোধ। নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, কেউ যদি আপনাকে বলে অমুক কাজটা করবার সাধ্য নেই আপনার, অদ্ভুত একটা জেদ চেপে যায় মনের মধ্যে, নিজের অজান্তেই সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন: যেমন করে হোক করবই, করে ছাড়ব! আর কেউ যদি আদেশের ভঙ্গিতে বলে অ্যাই, অমুক কাজটা করতে হবে তোমাকে, ওমনি মনের মধ্যে একটা আশ্চর্য প্রতিরোধ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, মনে মনে বলেন: কিছুতেই করব না, দেখি শালা কি করে করায়! এই ব্যাপারটা ঘটছে সরাসরি আপনার অবচেতন মনের প্ররোচনায়। এখানে জোরাজুরি চলে না। জোর খাটাতে গেলেই মনের গভীরে যে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি রয়েছে, সেটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। কাজেই একমাত্র উপায়, মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, আলগোছে ঢুকিয়ে দিতে হবে আইডিয়াটাকে অবচেতন মনে, অনেকটা অলক্ষে, সাদামাঠা তথ্যের ছদ্মবেশে।

আপনার যুক্তি বা মতামত যদি কাউকে দিয়ে সত্যিই গ্রহণ করাতে চান, তার অহমকে পাশ কাটিয়ে আলগোছে ঢুকতে হবে আপনাকে তার অবচেতন মনের মধ্যে। অবচেতন মনের দরজায় দিবারাত্র পাহারায় রয়েছে তার 'অহম' বা ইগো। মাঝে মাঝে একটু ঝিমুনি মত আসে তার, ঠিক তখনই চোরের মত পা টিপে ঢুকতে হবে। যদি একে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে বা খেপিয়ে তোলেন তাহলে আপনার সমস্ত অকাট্য যুক্তি আর গভীর তত্ত্বমূলক মতাদর্শ মাঠে মারা যাবে—কিছুতেই ঢুকতে দেবে না সে ভিতরে। এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি স্মরণ রেখে নিচের ছয়টি বিরোধ নিষ্পত্তির নিয়ম চর্চা করুন, দেখবেন মানুষকে পথে আনতে আপনার বিশেষ বেগ পেতে হবে না।

বলতে দিন

বাধা না দিয়ে প্রতিপক্ষকে তার বক্তব্য পুরোটা বলবার সুযোগ দিন। মন দিয়ে শুনুন। থামিয়ে দিলে বা বক্তব্যে বাধা দিলে অহমে আঘাত পাবে সে, ফলে অবুঝ হয়ে উঠবে সম্পূর্ণভাবে। পেটে কথা থাকলে বলতে চায় মানুষ, শুনবার মুডে থাকে না। যখন তার বক্তব্য সে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলবার সুযোগ পাবে, অনেকখানি

লাঘব হয়ে যাবে তার মনের ভাব, আপনার কথা শুনবার মত অবস্থায় আসবে সে। কাজেই আপনার বক্তব্য কাউকে শোনাতে চাইলে আগে তার বক্তব্য শুনতে হবে আপনার আগাগোড়া সবটা। যদি দেখেন বিক্ষোভের বাষ্প রয়ে গেছে একবার বলবার পরেও, তাহলে প্রথমে তাকে জিজ্ঞেস করুন তার আরও কিছু বক্তব্য আছে কিনা, যদি না থাকে কৌশলে প্রশ্ন করে করে পুরোটা ব্যাপার আরও একবার বা দু'বার বলান তাকে দিয়ে। দেখবেন, শুধু বলবার সুযোগ পেয়েই তার বেশির ভাগ বিক্ষোভ দূর হয়ে গেছে, ভাবাবেগ সামলে নিয়ে অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করবার মত অবস্থায় পৌঁছে গেছে সে।

বিরতি দিন

উত্তর দেওয়ার আগে সামান্য একটু বিরতি দরকার। আপনি যে প্রতিপক্ষের বক্তব্য ভেবে দেখে বিবেচনার পর উত্তর দিচ্ছেন, যা মনে বা মুখে আসছে তাই, কিংবা আগে থেকে সাজানো কথা বা মত প্রকাশ করছেন না, এটা তাকে বুঝতে দেয়া দরকার। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করলে আবার সে মনে করবে আপনি প্রশ্নটা এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল খুঁজছেন। প্রতিপক্ষের মুখের দিকে চেয়ে প্রতিটা প্রশ্নের জবাবের আগে সামান্য বিরতি দেয়া দরকার।

আংশিক সাফল্য

শতকরা একশো ভাগ জয়ী হবার চেষ্টা না করে আশিভাগ সাফল্যেই সন্তুষ্ট হতে চেষ্টা করুন। তর্ক করতে গিয়ে নিজের প্রতিটা কথাই ঠিক, আর প্রতিপক্ষের প্রত্যেকটা কথা ভুল—এই রকম মনোভাব বা প্রবণতা এসে যায় আমাদের মধ্যে। কিন্তু এটা ঠিক নয়। কিছু ছাড়তেই হবে আপনাকে। নিজেরই স্বার্থে।

প্রতিপক্ষের দু'একটা ভাল যুক্তি যদি মেনে নেন, দু'একটা ব্যাপারে যদি একমত হতে পারেন, এবং নিজের যুক্তির দু'একটা ছোটখাট ত্রুটি যদি স্বীকার করে নেন, তাহলে দেখবেন আসল প্রশ্নে খুব সহজেই রাজি করাতে পারবেন তাকে। 'তা ঠিক···কিন্তু···' কৌশল অত্যন্ত কার্যকরী কৌশল। যেমন:

'তা ঠিক, কিন্তু ব্যাপারটার আরও একটা দিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা না করলে···'

'তা ঠিক, আপাতদৃষ্টিতে অবশ্য তাই মনে হয়, কিন্তু···'

'তা ঠিক, হানড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট, কিন্তু আমার মনে হয় ব্যাপারটাকে ওভাবে না দেখে···'

নির্ভুল তথ্য

নিজের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে বাড়িয়ে বলবেন না কিছুই। নাটকীয়তার আশ্রয় নিতে যাবেন না ভুলেও। মনে রাখবেন, শান্তভাবে নির্ভুল তথ্য পেশ করলে খুব সহজেই মানুষের মত পরিবর্তন করা যায়। বাগাড়ম্বর, ভীতি প্রদর্শন বা অতি-নাটকীয়তা দিয়ে মানুষের মন জয় করা শক্ত। অনেক সময় মনে হতে পারে কাজ

হচ্ছে বুঝি এসবে—জোরাল যুক্তির ধার দিয়ে হয়তো কুচিকুচি করে ফেলবেন আপনি প্রতিপক্ষকে, হারিয়ে দেবেন, তাকে এমন একটা অবস্থায় ঠেলে নিয়ে আসতে পারবেন যখন নিজের মন্তব্যের জালে নিজেই আটকে গিয়ে একেবারে বোবা বনে যাবে সে। হয়তো প্রচুর হাততালি জুটবে আপনার ভাগ্যে শ্রোতৃমণ্ডলীর তরফ থেকে—কিন্তু আসল উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে, এসব করে প্রতিপক্ষের মত পরিবর্তন করতে পারবেন না আপনি কিছুতেই। বরং আরও জোরে আঁকড়ে ধরে থাকবে সে নিজের মত। আপনার কথামত একটি কদম ফেলবে না।

মতবিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে চমৎকার কৌশল অবলম্বন করতেন বেঞ্জামিন ফ্র্যাংকলিন। ইচ্ছে করলে আপনিও অনুসরণ করতে পারেন তাঁকে। প্রতিপক্ষের সব কথা শোনার পর নিরুত্তাপ কণ্ঠে শান্ত নরম ও নির্ভুলভাবে আপনার তথ্যভিত্তিক বক্তব্য বা সিদ্ধান্ত পেশ করুন। তারপর বলুন: এটাই অবশ্য চরম কথা নয়, আমার সিদ্ধান্তে ভুল থাকাও বিচিত্র নয়। প্রতিপক্ষ আপনার বক্তব্য গ্রহণ তো করবেই, যেহেতু আপনি নিঃসন্দেহ হতে পারছেন না, উল্টে আপনাকে বোঝাবে যে আপনার সিদ্ধান্তই সঠিক।

অন্যের দৃষ্টান্ত

আপনি যখন তর্ক করছেন, আপনার প্রতিটি যুক্তিকে সন্দেহের চোখে একটা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখবে আপনার প্রতিপক্ষ। ঠিক যে কারণে আদালতে নিরপেক্ষ সাক্ষীর কদর, চাকুরিদাতার কাছে অন্য কারও রিকমেন্ডেশনের কদর, সেই একই কারণে আপনার প্রতিপক্ষের কাছে আপনি ছাড়া অন্য যে কোন বিশ্বাসযোগ্য লোকের দৃষ্টান্ত অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হবে। ইতিহাস, পরিসংখ্যান, সবার জানা তথ্য বা উদ্ধৃতি ইত্যাদির সাথে আপনার প্রতিপক্ষের বিরোধ নেই, কাজেই এইসবের সাহায্যেই তার অহমকে পাশ কাটিয়ে মনের গভীরে ঢুকতে হবে আপনার।

কোন্ মিডিয়ামে ছেলেকে ভর্তি করবেন তাই নিয়ে আপনার স্ত্রীর সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বচসার চেয়ে এই ব্যাপারে অমুক নামজাদা ব্যক্তি কি বলছেন, ইংরেজি মিডিয়ামে ছেলেকে পড়াশোনা করিয়ে অমুক ভদ্রলোক কি কি অসুবিধেয় পড়েছেন, এবং বাংলা মিডিয়ামে পড়ানোর কি কি সুবিধে রয়েছে বলে মনে করেন বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ, ইত্যাদি তথ্য তুলে ধরলে পাঁচ মিনিটেই নিষ্পত্তি হয়ে যাবে বিরোধের।

মান রক্ষা

অনেক সময় এমন হয়, প্রতিপক্ষ হয়তো খুশিমনেই আপনার সাথে একমত হতে চায়, ভিতর ভিতর মত পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে তার, কিন্তু আটকে গেছে নিজেরই কথার জালে। হয়তো সে এমন সব কথা বলে ফেলেছে যেগুলো এখন আর তার পক্ষে ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। আপনার কথায় সায় দিতে গেলে তার নিজেকেই মিথ্যেবাদী প্রতিপন্ন হতে হয়।

কাজেই তার মান রক্ষার দায়িত্বও আপনার কাঁধে বর্তাচ্ছে। কৌশলে আপনার এমন কয়েকটা ফাঁক রাখতে হবে, যে-ফাঁক গলে মানমর্যাদা নিয়েই প্রতিপক্ষ বেরিয়ে আসতে পারে। তা না হলে নিজেরই যুক্তিতর্কের জালে বন্দী হয়ে থাকবে প্রতিপক্ষ, না পারবে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে, না পারবে আপনার মত গ্রহণ করতে। তাকে এই ত্রিশংকু অবস্থা থেকে রক্ষা করতে না পারলে আপনার কাজ সম্পূর্ণ হচ্ছে না। দুটো উপায়ে উদ্ধার করতে পারেন তাকে।

এক, এমন ভাব করুন যেন সব তথ্য প্রতিপক্ষের জানা ছিল না। 'বুঝতে পারছি কেন আপনি ওই রকম ভেবেছিলেন, অমুক অমুক তথ্য তো আর আপনার জানা ছিল না।' তার ভুলটাকে সহজ করে দেখান। 'আপনার অবস্থায় যে কেউ এই কথাই ভাবত। আমি নিজেও ভাবতাম। কিন্তু অমুক ব্যাপারটা যখন জানতে পারলাম, সম্পূর্ণ ধারণা পাল্টে গেল আমার।'

দুই, তাকে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাবার সুযোগ করে দিন। স্বামীর জন্যে কেনা শার্ট নিয়ে ফেরত আসা গিন্নীকে বলুন, 'হয়তো ভুল করে কেউ শার্টটা লণ্ড্রীতে পাঠিয়ে দিয়ে থাকবে। আমার নিজেরই একটা প্যান্ট চলে গিয়েছিল ধোপাবাড়ি···আনকোরা নতুন। চাকরটার কাজ। আপনারও বোধহয় এই একই ব্যাপার হয়েছে, কারণ, দেখুন, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে লণ্ড্রীর চিহ্ন।'

অকাট্য প্রমাণ দেখে ভিতর ভিতর চমকে যাবেন ভদ্রমহিলা, কিন্তু আপনার তৈরি করে দেয়া ফাঁক গলে নিরাপদে বেরিয়ে যেতেও অসুবিধা হবে না তাঁর। এজন্যে কৃতজ্ঞ থাকবেন মহিলা আপনার কাছে।

ভিনি ভিডি ভিসি

কিছু মানুষ আছে, চট করে খাতির জমিয়ে ফেলতে পারে সবার সাথে। আপনার আশেপাশেই আছে এই রকম মানুষ। আপনিই হয়তো পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন তাকে আপনার এক অমিশুক, গুরুগম্ভীর বন্ধুর সাথে, পাঁচ মিনিট পর তাদের আলাপ শুনে মনে হচ্ছে গত দশ বছর ধরে তারা একে অন্যের বুজুম ফ্রেন্ড।

আবার এরকমও মানুষ আছে, চমৎকার মানুষ, কিন্তু চট করে বোঝা যায় না। অনেকদিন মেলামেশার পর ধীরে ধীরে চেনা যায় তাদেরকে। এরকম চাপা প্রকৃতির লোকও দেখেছেন আপনি অসংখ্য। আপনার আশেপাশেই।

'অসংখ্য' শব্দটা ব্যবহার করলাম এই জন্যে যে, এই দলেই পড়ে বেশির ভাগ মানুষ। প্রায় সব মানুষই আসলে ভাল, কিন্তু চাপা। আবিষ্কার করে নিতে হয় তাদের ভালত্ব। চিনে নিতে সময় পেরিয়ে যায় অনেক।

বাস্তব জীবনে চলতে ফিরতে এই দ্বিতীয় দলকে অনেক রকম অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয়। কারও কাছ থেকে কোনো কাজ বা ব্যবসা আদায় করতে গিয়ে ঘনিষ্ঠতাপর্ব শেষ হওয়ার আগেই এরা দেখে প্রথম দলের কেউ এসে যাদুমন্ত্রবলে কাজ উদ্ধার করে নিয়ে বাড়ি চলে গেছে।

এই 'এলাম দেখলাম জয় করলাম'-এর দল কি করে পারছে এটা? আমি-আপনি পারছি না কেন? কি বিশেষ গুণ রয়েছে ওদের মধ্যে যে, পরিচয় হতে না হতেই তাদের বন্ধু হয়ে যাচ্ছে মানুষ? আমাদের মধ্যে কিসের অভাব?

যখন কলেজে পড়তাম, একরাম বলে একটা ছেলে পড়ত আমাদের ক্লাসে। সবার সাথেই ভাব ছিল তার। সবাই পছন্দ করত তাকে। ছেলে-মেয়ে সবাই, এমন কি অধ্যাপক পর্যন্ত। ক্লাসে মাঝে-মধ্যে মজা করতে গিয়ে এমন সব কাণ্ড করত ও যেসব করলে অন্য যে-কোন ছেলেকে বের করে দেয়া হত ক্লাস থেকে—কিন্তু ওর বেলায় কিছু বলতেন না, হাসতেন টিচাররা। আমি নিজে লাজুক প্রকৃতির মানুষ ছিলাম। একরামের জনপ্রিয়তা নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছিলাম সে সময়ে। এবং পরবর্তীকালেও। উত্তর পেয়েছি এই কিছুদিন আগে মনোবিজ্ঞানী হ্যারি ওয়াকার হেপনারের ইয়া মোটা পাঠ্য-পুস্তক 'সাইকোলজি অ্যাপ্লায়েড টু লাইফ অ্যান্ড ওয়ার্ক'-এর পাতায়।

গোটা ব্যাপারটাই নির্ভর করছে আসলে দৃষ্টিভঙ্গির উপর। আমরা, সাধারণরা, যখন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগি, মানুষ আমাদের কিভাবে গ্রহণ করবে, পছন্দ করবে কি করবে না, ইত্যাদি ব্যাপারে সংকোচ কাটিয়ে উঠতে পারি না, একরামের দল তখন নিঃসংকোচে ধরে নেয় মানুষ তাদের পছন্দ করবেই। এই ব্যাপারে তাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই বলে তাদের আচার-ব্যবহারে কোথাও কোন জড়তা থাকে না।

মানুষও তারা যা আশা করছে ঠিক সেইমত আচরণ করতে বাধ্য হচ্ছে।

আমরা জানি, বাস্তব রঙ্গমঞ্চে যাকে যে ভূমিকা দেয়া হবে, অর্থাৎ যার কাছে যে আচরণ আশা করা হবে, সেই ভূমিকাই পালন করবে মানুষ। শুধু তাই নয়, এই ধরে নেয়ার আর একটি সুবিধে আছে। যেহেতু একরাম বিশ্বাস করছে মানুষ তাকে পছন্দ করবে, বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেবে, সাহায্য ও সহযোগিতা দেবে, সেইহেতু ভয় পাচ্ছে না সে মানুষকে। প্রতিরক্ষার বর্ম পরে হিসেব করে চলতে হচ্ছে না তাকে, স্বতঃস্ফূর্ত সহজভাবে নিঃসংকোচে এগিয়ে যাচ্ছে সে মানুষের কাছে।

'মানুষের ভয় মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখে মানুষ থেকে।'

ওপরের কথাটা বার কয়েক জোরে পড়ুন। ভাল মত বসিয়ে নিন কথাটি মনের মধ্যে। শুনতে ভাল তাই রচনা করা হয়নি বাক্যটা, এর অন্তর্নিহিত গূঢ় তাৎপর্য রয়েছে।

আমরা যে চট করে কারও সাথে খাতির বা বন্ধুত্ব জমাতে পারি না তার গোড়ার কারণ খুঁজতে গেলে দেখবেন আর কিচ্ছু নয়, মূলে রয়েছে ভীতি। আমরা ভয় পাই, যার সাথে মিশতে যাচ্ছি সে হয়তো আমাকে পছন্দ করবে না, সাহায্য তো করবেই না, হয়তো কড়া এক ধাতানি লাগাবে। কাজেই আগে থেকেই শামুকের মত খোলের ভিতর ঢুকে বসে থাকি আমরা আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্যে। এগোই গুটি গুটি, শামুকের মত। কল্পিত আক্রমণের ভয় দূরে ঠেলে রাখে মানুষকে। তারা আমাদের বেশি কাছে আসতে পারে না, আমাদের সতর্কতা ও ভয় সংক্রামিত হয় তাদের মধ্যেও, ফলে তারাও দূরে দূরে থাকে আমাদের থেকে।

'মানুষ আমাকে পছন্দ করবে না' এই অ-বন্ধুসুলভ ভাব নিয়ে যার সাথেই মিশতে যান না কেন, দেখবেন কথাটা সত্যে পরিণত হতে চলেছে। আপনি নিজেই তার আচার-আচরণ প্রভাবিত করছেন না-বাচক ভাব ও ব্যবহারের মাধ্যমে। আবার ঠিক উল্টোটাও সত্য। আপনার ভাবভঙ্গিতে যদি প্রকাশ পায় যে আপনার ধারণা বেশির ভাগ মানুষই ভাল এবং অমায়িক, আপনার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে আগ্রহী—তাহলে দেখবেন, এটাও সত্যে পরিণত হতে চলেছে। ব্যাপারটা নির্ভর করছে সম্পূর্ণ ভাবে আপনার নিজেরই ধ্যান-ধারণার উপর।

সবসময়েই যে এটা ঠিক হবে এ দাবি কেউ করে না, তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যে ঠিক তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। পরীক্ষা করে দেখলে আপনিও ফল পাবেন। বিফলতার হার এতই কম হবে যে বুঝতে পারবেন ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ভীতিকে কাছে ঘেঁষতে না দিয়ে আপনি ধরে নেবেন যার কাছে যাবেন সে-ই বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেবে। মনে রাখবেন, বেশির ভাগ মানুষ, আপনার মতই, বন্ধুলাভে আগ্রহী। এটা সর্বজনীন ব্যাপার। যারা গাম্ভীর্য আর নিরাসক্তির বর্ম পরে দূরে সরে থাকছে, খুব সম্ভব তারা ভয় পাচ্ছে আপনাকে, ভয় পাচ্ছে এগোতে, পাছে আপনি তাদের প্রত্যাখ্যান করেন।

কাজেই এগোতে হবে আপনাকেই প্রথম। অপর পক্ষ থেকে কোন সাড়া বা বন্ধুত্বের লক্ষণের জন্যে অপেক্ষা করবার দরকার নেই। আপনি এক কদম এগোলে দেখবেন দশ কদম এগিয়ে এসেছে সে।

অতি-আগ্রহ

মানুষের সাথে মেলামেশার সময়ে এই একটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে আপনার। আপনার ব্যবহারে কিছুতেই যেন অতি-আগ্রহ প্রকাশ না পায়।

কাউকে কোন বিষয়ে অতিরিক্ত আগ্রহী দেখলে মানুষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে কিছুটা পিছপা হয়ে কারণটা তলিয়ে দেখা। সন্দেহপ্রবণ হয়ে ওঠে সে। আপনাকে বেশি আগ্রহী দেখলে দোকানদার যেমন জিনিসের দাম চড়িয়ে দেয়, তেমনি আর সবার মধ্যেও একটা দর কষাকষির মনোভাব এসে যাবে। থমকে গিয়ে দ্বিতীয়বার চিন্তা করবে সে এই আগ্রহের পিছনে আপাতদৃষ্টিতে যা দেখা যাচ্ছে তার বাইরে আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে। বন্ধুত্বভিখারী থেকে দূরে সরে থাকতে চায় মানুষ। মানুষের কোন দোষ নেই, এখানেও মনস্তত্ত্বের সেই একই নিয়ম কাজ করছে। অতি-আগ্রহ আসছে কেন আপনার মধ্যে? আপনি যদি নিশ্চিন্ত থাকেন যে আপনাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে মানুষ, তাহলে আপনার ব্যবহারে অতি-আগ্রহ প্রকাশ পাবে না। এটা আসছে এই জন্যে যে আপনি ভয় পাচ্ছেন আপনাকে আরেকজন পছন্দ করবে না, যা চান সেই মত কাজ করতে চাইবে না। আপনার এই ভাবটা আপনার অজান্তে ঠিকই বুঝে নিচ্ছে অপরে, সরে যাচ্ছে দূরে।

কাজেই মানুষের সাথে মেলামেশার অতিরিক্ত আগ্রহ দেখাতে যাবেন না কখনও। শান্ত সহজভাবে ধরে নিন ভাল ব্যবহার পাবেন। সেইসাথে যদি মৃদু হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারেন ঠোঁটের কোণে, তাহলে আপনাকে প্রতিরোধ করতে পারে এমন সাধ্য খুব কম লোকেরই হবে। হাসির অর্থ হচ্ছে, আপনি নিশ্চিন্ত, উদ্বেগশূন্য, দ্বিধামুক্ত, আত্মপ্রত্যয়ী এবং স্বতঃস্ফূর্ত।

এতগুলো ভাব প্রকাশ করছে যে একটি মাত্র জিনিস হাসি, সেটা নিয়ে একটু বিশদ আলোচনা হওয়া দরকার।

মৃদু হাসি

মানুষের আচার-ব্যবহারে কোথাও যদি সত্যি জাদু বলে কিছু থাকে, সেটা রয়েছে তার হাসিতে। শুধু একটুকরো হাসি দিয়ে আপনি দু'জনের মধ্যেকার এক-পাহাড় ব্যবধান দূর করতে পারেন, মুহূর্তে। হাসির অর্থ: আমি তোমাকে পছন্দ করি, আমি এলাম তোমার বন্ধু হয়ে, আমি জানি তুমি আমাকে পছন্দ করবে। আরও একটি অর্থ আছে: তুমি হাসি দিয়ে আপ্যায়িত হওয়ার যোগ্য।

মানুষের মনটাকে অনেক বড় করে দেয় এই শেষোক্ত অর্থ। সবার থেকে আলাদা করে তাকে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে সবিশেষ মর্যাদায়। উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মানুষ, তারও মুখে ফুটে ওঠে স্মিতহাসি।

পনেরো বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ভাইভা পরীক্ষা দিয়েছিলাম। কে কি প্রশ্ন করেছিলেন, কি উত্তর দিয়েছিলাম কিচ্ছু মনে নেই; শুধু মনে আছে দুটো ব্যাপার: একজন অধ্যাপকের অপ্রত্যাশিত দুর্ব্যবহার, আর মুনির স্যারের অভয়স্মিত হাসির কথা।

হাসতে গিয়ে দাঁত ভেংচি কাটবার কোন অর্থ হয় না। হাসি আসছে না, তবু দেঁতো-হাসি হাসলে কোন লাভ নেই। সত্যি সত্যিই হাসতে হবে। আন্তরিক হাসি। কিন্তু সেটা কি সম্ভব? ইচ্ছে করলেই কি হাসির উপরও নিয়ন্ত্রণ আনতে পারি আমরা? চর্চা করলেই কি আন্তরিক হাসি হাসা সম্ভব?

মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন: সম্ভব। আসলে সবার মনের মধ্যেই স্বতঃস্ফূর্ত হাসির ফোয়ারা রয়েছে। আপনার মধ্যেও। ছোটবেলা থেকে আমাদেরকে মনের সত্যিকার ভাব গোপন করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে—হাসি আসছে কিন্তু হাসব না, রেগে গেছি কিন্তু নির্বিকার ভাব দেখাব, ভয় পেয়েছি কিন্তু সেটা প্রকাশ করা চলবে না, হিংসেয় জ্বলে যাচ্ছে অন্তরটা কিন্তু ভাব দেখাচ্ছি যেন কিছুই হচ্ছে না, ঘৃণায় কুঁচকে উঠতে চাইছে নাক কিন্তু চেষ্টা করছি সেটা গোপন করতে। আমরা শিখেছি, মনের সত্যিকার ভাব মুখে বা চেহারায় ফুটে ওঠা ঠিক মার্জিত রুচির পরিচয় নয়। গল্পে-উপন্যাসে পড়েছি মনের ভাব গোপন রাখতে পারাটাই নায়কোচিত কাজ। ঈর্ষা ক্রোধ বা বিরক্তির ব্যাপারে কথাটা কিয়দংশে প্রযোজ্য হলেও এই নীতি হাসি আনন্দ সহানুভূতি বা বন্ধুত্বের ব্যাপারেও প্রয়োগ করি আমরা অনেকটা অভ্যাসবশেই। এটা মোটেই উচিত কাজ নয়। হাসি-খুশির ব্যাপারে আলগা করে দিতে হবে আপনার সংযমের বাঁধন। বিনা দ্বিধায় প্রকাশ করতে হবে মনের সত্যিকার ভাব। এটা অভ্যাস করলেই দেখবেন, আপনার নিজস্ব একটা অপূর্ব সুন্দর মিষ্টি হাসি আছে। মনের ভাব প্রকাশ করে ফেলবার ভয়টা দূর হলেই, স্ব-আরোপিত অনর্থক শাসন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলেই আন্তরিক হাসি ফুটে উঠবে আপনার মুখে।

তবে এই ব্যাপারে কিছুটা প্র্যাকটিসের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন মনোবিজ্ঞানী লেস গিবলিন। রোজ সকালে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মজার কোন অতীত ঘটনার কথা স্মরণ করুন। তারপর মনের বাঁধন আলগা করে দিয়ে চোখেমুখে খুশির প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠতে দিন। নিজের আন্তরিক হাসিটা চিনে রাখুন। অনুভব করবার চেষ্টা করুন ঠিক কোন্ কোন্ পেশীর ব্যবহার হচ্ছে।

যদি নিজেকে আশৈশব শাসন করে করে এমন পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে থাকেন যে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভিতর ভিতর হেসে কুটিপাটি হয়ে যাচ্ছেন কিন্তু বাইরে তার বিন্দুমাত্র প্রকাশ ঘটছে না, মনে হচ্ছে যেন গম্ভীর একটা মুখোশ আঁটা রয়েছে আপনার মুখের উপর, তাহলেও ঘাবড়াবার কিছুই নেই। 'চীজ' বলে হাসুন। হাসির জন্যে মুখের পেশীগুলোরও অভ্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন আছে। তাছাড়া উইলিয়াম জেমস বলছেন: আপনার ভাব যেমন আপনার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে, যেমন খুশি হলে হাসি, বিষণ্ন হলে গাম্ভীর্য ইত্যাদি; তেমনি আবার আপনার আচরণও নিয়ন্ত্রণ করে আপনার ভাবকে। মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলুন, কিছুতেই বিষণ্ন থাকতে পারবেন না; ভ্রূ কুঁচকে বিরক্ত ভাব ধারণ করুন, কিছুতেই সুখী হতে পারবেন না। চীজ বলে হাসি অভ্যাস করলে কিছুদিনের মধ্যেই সত্যিকার আন্তরিক হাসিতে রূপান্তরিত হবে সেটা। এভোলিউশন থিয়োরীর জন্মদাতা চার্লস ডারউইনও তাঁর 'এক্সপ্রেশন অভ ইমোশনস ইন ম্যান অ্যান্ড অ্যানিম্যালস' বইয়ে বলছেন: কোন ভাব বা ভাবাবেগ

যদি আচরণে প্রকাশ করা না হয় তাহলে সেটাকে পুরোপুরি উপলব্ধি করা যায় না। ছোট্ট বই। কুকুর বিড়াল বানর থেকে শুরু করে বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ার এবং মানুষের ভাবাবেগ প্রকাশের কথা অত্যন্ত সরস ভাষায় বর্ণনা করেছেন লেখক, খুবই মজা পাবেন পড়তে, সম্ভব হলে পড়ে নেবেন—অনেক সাহায্য হবে আপনার নিজেকে বুঝতে।

তাহলে মোটামুটি ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এইরকম: আপনার মনের খুশি প্রতিচ্ছবি ফেলুক আপনার মুখে। মুখের হাসিহাসি ভাব প্রতিচ্ছবি ফেলুক আপনার মনে। এইভাবে খুব অল্পদিনেই আপনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চিনে নিতে পারবেন আপনার সত্যিকার আন্তরিক হাসি। তারপর ব্যবহার করুন এটাকে লোক-সম্পর্ক উন্নয়নের কাজে। মনে রাখবেন, কোটি টাকার সম্পদ এটা আপনার। একে যদি উপযুক্ত ব্যবহার না করেন আপনার অবস্থা দাঁড়াবে সেই লোকটির মত, যার কোটি কোটি টাকা রয়েছে ব্যাংকে, কিন্তু চেক বই নেই।

কাউকে প্রশংসা করছেন, সেইসাথে একটু হাসুন, বহুগুণ বেড়ে যাবে প্রশংসার মূল্য।

কারও কাছে কিছু চাইছেন, সেই সাথে একটু হাসুন, আপনাকে সাহায্য করবার আগ্রহ বেড়ে যাবে তার বহুগুণ।

কারও সাহায্য গ্রহণ করছেন, হাসুন, দাতার মহিমা বেড়ে যাবে শতগুণ।

কাউকে প্রত্যাখ্যান করতে হচ্ছে, একটু হাসুন, বিষাক্ত হবে না শ্রোতার মন।

কারও সাথে পরিচিত হচ্ছেন, মিষ্টি করে হাসুন, তার মনে হবে যুগ যুগ ধরে চেনে সে আপনাকে।

হাসির জাদু প্রয়োগ করুন, মানুষ সুখী হবে, আপনিও সুখী হবেন।

শুনো দিয়া মন

চারপাশের সবাই প্রতিমুহূর্তে ওজন করছে,বিচার ও বিশ্লেষণ করে নিচ্ছে আমাদেরকে। কিসের ভিত্তিতে? কথা—যা বলছি তার ভিত্তিতে। শুধু তাই নয়, কথা—যা শুনছি তার ভিত্তিতেও।

কারও সাথে দেখা করলেন, কথা বললেন, কিন্তু বেরিয়ে এসে বুঝতে পারলেন, ঠিক যেমন চেয়েছিলেন তেমনি ভাবে গ্রহণ করেনি লোকটা আপনাকে। সন্দেহ হচ্ছে, ভজাতে পারেননি আপনি তাকে। 'কি বললাম, যাতে বিরুদ্ধে চলে গেল লোকটা?' মনে মনে ভাবেন আপনি। অথবা প্রশ্ন করেন নিজেকেই, 'আর কি বললে লোকটার বন্ধুত্ব অর্জন করা যেত?'

শুনলে হয়তো অবাক হবেন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উত্তর হচ্ছে: 'কিছুই না।'

আপনি বিফল হয়েছেন কি বলেছেন কিংবা কি কি বলতে বাকি রেখেছেন সেজন্যে নয়; হয়েছেন, খুব সম্ভব, যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে তার কথা শোনেননি বলে।

আমরা সবাই চাই অপরে আমাদের সপ্রতিভ বুদ্ধিমান লোক মনে করুক। কিন্তু জানি না যে প্রচুর বকবক করলে বা চোখা মন্তব্য করলেই কেউ কাউকে বুদ্ধিমান বলে মনে করে না—বড়জোর বাচাল, অতি-চালাক বা ফাজিল ফক্কড় ধরে নেয়। অন্যের চোখে জ্ঞানী গুণী বুদ্ধিমান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার একটি মাত্র উপায় হচ্ছে: মন দিয়ে তার কথা শোনা। আপনি যে তার বক্তব্যকে মূল্যবান মনে করছেন, মন দিয়ে শুনছেন যাতে একটি শব্দও বাদ পড়ে না যায়, এটাই তার কাছে অব্যর্থ প্রমাণ যে আপনি সত্যিকারের একজন বুদ্ধিমান লোক। নির্বোধ লোক কখনও কারও কথা শোনার দরকার মনে করে না।

নিজের বন্ধুবান্ধব আর পরিচিত জনের দিকে একটু নজর করলেই আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে ব্যাপারটা আপনার কাছে। এদের মধ্যে কাকে আপনার সবচেয়ে বুদ্ধিমান বলে মনে হয়? যে লোকটা সর্বক্ষণ বকর বকর করে কান ঝালাপালা করছে, তাকে? কথা ফুরোতে না ফুরোতেই, কিংবা মাঝ পথেই যে আপনাকে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্নটা ঠিক মত না বুঝেই উত্তর দেয়ার জন্যে প্রস্তুত, তাকে? নাকি যে লোকটা ধৈর্য ধরে মনোযোগ দিয়ে আপনার কথা শুনছে, তাকে? একটু ভেবে দেখুন, উত্তরটা আবিষ্কার করতে পারবেন নিজেই।

একটি আপ্তবাক্য এই সূত্রে স্মরণীয়: 'ঈশ্বর দুটি কান দিয়েছেন মানুষকে, একটি মুখ—বলার চেয়ে দ্বিগুণ শোনার জন্যেই।'

মানুষের কাছে গ্রহণীয় হতে হলে তার চাহিদা মেটাতে হবে আপনার। সেটা করতে হলে আগে জানতে হবে সে কি চায়। তা নইলে তার অভাব পূরণ করবার প্রশ্নই ওঠে না। আপনার মধ্যে চাহিদা মেটাবার ক্ষমতা না থাকলে কানাকড়ি দামও

দেবে না কেউ আপনাকে। পারস্পরিক সমঝোতা ছাড়া মানুষের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা যায় না। টেবিল-টেনিসের কথাই ধরা যাক। অন্ধকারে খেলতে পারবেন না আপনি এই খেলা। ঠিক মত খেলতে হলে আপনার জানতে হবে অপর পক্ষ ফোরহ্যান্ড বা ব্যাকহ্যান্ড কোন্ দিক থেকে বলটা মারছে, টপস্পিন আসছে না চপ্ আসছে না জ্যাব আসছে, সেইসাথে আবার সাইড স্পিন থাকছে কিনা। লোক-সম্পর্কের ব্যাপারটাও অনেকটা তেমনি। আপনার জানতে হবে সত্যি সত্যিই কি চায় লোকটা, কোন বিষয় সম্পর্কে তার কি ধারণা, ঠিক কেমন ভাবে তার ব্যক্তিগত বিশেষ প্রয়োজন মিটতে পারে। এটা বুঝতে না পারলে আপনি অন্ধকারে থাকছেন, বলটা আয়ত্তে আনা তো দূরের কথা, ব্যাট হাতে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায়ান্তর নেই।

মানুষের অবস্থা, চাহিদা ও ভাবধারা বুঝতে হলে থটরিডিং শেখার দরকার নেই আপনার। আর কিচ্ছু না—মন দিয়ে তার কথা শুনুন। প্রত্যেকে তার কথা জানাতে চায় আমাদের, আকুলি-বিকুলি করে বুঝিয়ে বলার জন্যে। অসুবিধে হচ্ছে, আমরা আমাদের রিসিভার অফ করে দিয়ে নিজেরাই ব্রডকাস্টিং শুরু করে দিই।

বেশি কথা

বেশি কথার সবচেয়ে বড় অসুবিধে হচ্ছে এই যে ধরা পড়ে যাচ্ছেন আপনি মানুষের কাছে। যতই গোপন করবার চেষ্টা করুন না কেন, কথা যদি বেশি বলেন মনের সত্যিকার ভাব চেপে রাখতে পারবেন না আপনি কিছুতেই। কিন্তু প্রায়ই এটা দরকার পড়ে আমাদের। নিজেরা ঠিক কি ভাবছি বা কি স্থির করেছি জানতে না দিয়ে মানুষকে আগে বাজিয়ে দেখতে চাই, বুঝে নিতে চাই তার মতিগতি। ব্যবসার ক্ষেত্রে বা রাজনৈতিক মতাদর্শের ব্যাপারে কিংবা অন্য যে-কোন বিষয়ে যদি অন্যের অবস্থানটা আগে জেনে নিতে চান, নিজের মুখ বন্ধ রেখে অন্যের মুখ চালু করবার কৌশল রপ্ত করতে হবে আপনার।

সাইকো-অ্যানালিসিসের জনক সিগমুণ্ড ফ্রয়েড প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, কাউকে দিয়ে যদি যথেষ্ট পরিমাণে কথা বলাতে পারেন, তার মনের আসল ভাব, বাসনা, ইত্যাদি প্রকাশ হয়ে পড়তে বাধ্য। যত চেষ্টাই করুক না কেন, কিছুতেই মনের ভাব চেপে রাখতে পারবে না সে, তার অবচেতন মন যেমন ভাবে পারে সবকিছু প্রকাশ করে দেবেই। আপনি যদি সতর্ক থাকেন, তার প্রতিটা বাক্য মন দিয়ে শোনেন, তার অবচেতন মনের ইঙ্গিতে ঠিক কথাটা ধরে ফেলতে পারবেন।

সেই একই কথা আপনার বেলাতেও প্রযোজ্য। যদি মনের ভাব গোপন রাখতে চান, নিজে বেশি কথা না বলে অন্যকে দিয়ে বলান।

আত্মসচেতনতা

কথা কম বলে শোনার দিকে মন দিলে আরও একটা ব্যাপারে উপকার হবে আপনার: অনেকাংশে দূর হয়ে যাবে আত্মসচেতনতা। যদিও আত্মকেন্দ্রিকতা বা আত্মপ্রেমকে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখছেন, সাধারণ মানুষ এ-

সবকে আগে যেমন, এখনও তেমনি খারাপ চোখে দেখে। আপনার মধ্যে যদি এর আধিক্য থাকে মানুষ আপনাকে ঠিকই বিরূপ দৃষ্টিতে দেখবে, আপনার সাফল্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।

অন্যের কথায় যদি গভীরভাবে মনোনিবেশ করতে পারেন, তার প্রতিটা কথা ও উচ্চারণভঙ্গি যদি লক্ষ করতে পারেন, তাহলে শুধু যে তার মনের আসল ভাবই আপনার কাছে ধরা পড়বে তাই নয়, আপনার মনোযোগ নিজের উপর থেকে সরে যাচ্ছে অন্যদিকে। এটাই দরকার। আপনার এবং অন্যের মাঝখানে উইণ্ডশীল্ডের স্বচ্ছ কাঁচের মত সব সময় বিরাজ করছে আপনার 'আত্ম' (Self)। এই আত্মকে ভেদ করে মনোযোগটা বাইরের কিছুতে নিতে হবে। গাড়ি চালাতে গিয়ে শুধু যদি সামনের উইণ্ডশীল্ডের দিকে চেয়ে থাকেন, সেটা ভেদ করে পথ-ঘাট গাড়িঘোড়া দেখতে না পান তাহলে কি ঘটবে তা বলে দেয়ার জন্যে হস্তরেখাবিদের প্রয়োজন নেই। নিঃসন্দেহ থাকতে পারেন, জোর গোঁত্তা খেতে যাচ্ছেন আপনি। মানুষে মানুষে যে ঠোকাঠুকি লেগে যাচ্ছে হরহামেশা তার প্রধান কারণই হচ্ছে সাধারণত উইণ্ডশীল্ড (আত্ম) ভেদ করে আমরা সামনের আর কাউকে দেখতে পাই না।

আরেকজনের কথায় যখন মন দেবেন, ডুবে যাবেন তার বক্তব্যে, নিজের অজান্তেই আত্মসচেতনতা দূর হয়ে যাবে আপনার। যেই মুহূর্তে আপনি ভাবতে বসলেন, 'ওর এই কথার পিঠে ওর চেয়ে এক ডিগ্রি বাড়া কি বলা যায়?' ওমনি আপনার 'আত্ম' এসে দু'জনের যোগাযোগ সূত্র কেটে দিচ্ছে। যদি নিজের বাহাদুরির কথা ভুলে বক্তার কথায় গভীর মনোনিবেশ করতে পারেন, দেখবেন হঠাৎ করেই অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনার মাথায় আশ্চর্য সব চমকপ্রদ চোখা কথা আসছে।

মানুষকে দিয়ে কিছু করাতে হলে তাকে বুঝতে হবে। তাকে বুঝতে হলে তার কথা শুনতে হবে। হ্যাঁ, ধৈর্যের সাথে, সহানুভূতির সাথে, সতর্কতার সাথে মন দিয়ে শুনতে হবে। বেশির ভাগ বৈবাহিক সমস্যা এই শোনারই সমস্যা। শিল্প বাণিজ্যেও তাই। তরুণদের বিক্ষোভও এই শোনার ব্যাপারেই। প্রায়ই তরুণদের মুখে শুনবেন: 'বড়রা কিছুতেই কিছু বুঝতে চায় না। আমার সমস্যা, আমার অসুবিধে, আমার চিন্তা ভাবনার কথা কত চেষ্টা করেছি বলতে—শোনে না। হয় আমাকে সেদিনের বাচ্চা মনে করে আমার সমস্যাকে গুরুত্ব দেয় না, নয়তো কিছু না বুঝেই উচিত-অনুচিত সম্পর্কে বড় বড় বুলি আর উপদেশ খয়রাত শুরু করে। আমি যে কি অবস্থায় আছি বুঝলই না ওরা।'

এর পরেও কি ডেলিংকোয়েন্সির জন্যে ওদের দোষ দেয়া উচিত হবে? মা-বাবা যদি একটু শুনতেন, কিছুটা ধৈর্য ও সহানুভূতি ব্যয় করতেন তাহলে আমাদের তরুণদের পক্ষে আমাদের ছাড়িয়ে অনেক এগিয়ে যাওয়া সহজ হত; লক্ষ লক্ষ তরুণকে এই অগ্রগামী দুনিয়ায় তাদের পূর্ব পুরুষের চেয়ে বিদ্যায় বুদ্ধিতে খাটো হয়ে থাকতে হত না। এই দুনিয়ার অনেক দুঃখ অনেক দুর্দশা অনেক বিফলতা দূর হয়ে যেতে পারত—শুধু যদি কেউ শুনত।

শোনার ব্যাপারে কয়েকটা অবশ্য-কর্তব্যের কথা দিয়েই এই আলোচনার

সমাপ্তি টানা যাক। বক্তার মুখের দিকে চেয়ে কথা শুনুন, এতে বক্তব্য বুঝতে সুবিধে হবে। একাত্ম হয়ে যান তার সাথে—উপযুক্ত জায়গায় মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিন, হাসির কথায় হাসুন, আপনি যে সত্যিই শুনছেন এসব তার নিশ্চিত প্রমাণ। বক্তার দিকে সামান্য একটু ঝুঁকে থাকুন। কোন কথা বুঝতে না পারলে চট করে জিজ্ঞেস করে নিন—এতে প্রমাণ হয় যে আপনি আগ্রহ নিয়ে শুনছেন, অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভদ্রতার খাতিরে শুনছেন না। কথার মাঝখানে বাধা দেবেন না কাউকে, বরং বিশেষ বিশেষ জায়গায় আরও একটু বিশদ বর্ণনা দেয়ার অনুরোধ করুন। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করবেন না। কথা বলতে বলতে অন্য প্রসঙ্গে চলে গিয়ে বক্তা যদি পথ হারিয়ে ফেলে, জিজ্ঞেস করে, 'কি যেন বলছিলাম?'— চট করে তাকে তার বক্তব্য ধরিয়ে দিন। তার কথা সম্পূর্ণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই নিজের কথা শুরু করবেন না।

সাফল্যের পথ যদি মসৃণ করতে চান, একটি প্রধান উপায় হচ্ছে: শুনো দিয়া মন।

সমালোচনা

'তোমার ভালর জন্যেই বলছি,' বলে আমরা মানুষকে যা বলি, শতকরা পঁচানব্বই ভাগ ক্ষেত্রে সেটা মোটেও তার ভালর জন্যে বলি না, বলি তার দোষ দেখিয়ে নিজেকে বড় প্রমাণ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে। অন্যের ঘাড়ে চড়ে আমরা আমাদের আত্মপ্রেম বৃদ্ধি করবার চেষ্টা করি, অনেক সময় নিজের অজান্তেই। ছিদ্রান্বেষণ, মানুষকে ছোট করা, টিটকারি মারা বা তার আড়ালে দুর্নাম করা—এসব আসলে আত্মপ্রেমের অভাব থেকেই আসে।

'কাউকে ছোট করতে চাইলে ছোট হতে হবে তোমাকে,' বলেছেন জন ডি. মারফি।

কিন্তু তাই বলে সমালোচনা করা যাবে না? কেউ ভুল করছে দেখলেও মুখ বুজে থাকতে হবে? শুধরে দেব না তাকে?

দেব। কিন্তু সেটা এমনভাবে করব যাতে সত্যিই তার উপকার হয়। আমার আত্মপ্রসাদের খাতিরে কারও দোষ খুঁজতে যাব না। ওকে ছোট করে নিজেকে বড় প্রমাণ করবার চেষ্টাকে সমালোচনা বলে না। কাউকে দুঃখ দেয়া বা তাকে মিছরির ছুরি দিয়ে কুচিকুচি করে ফেলার নাম সমালোচনা নয়। সমালোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য হতে হবে ওকে ভাল কিছু করতে সাহায্য করা, গড়ে তোলা।

সমালোচনার সঠিক নিয়ম জানি না বলে জীবনে চলার পথে অসংখ্য হোঁচট খেতে হয় আমাদের। শুধু এই জ্ঞানের অভাবেই দেখবেন এখানে-সেখানে নানান ব্যাপারে গুবলেট বাধিয়ে বসে আছেন।

আমেরিকান এয়ারলাইনসের ভাইস প্রেসিডেন্ট ওয়াল্টার জনসন বলছেন: 'কোন পাইলট যখন প্লেন নিয়ে এয়াপোর্টে নামবার উপক্রম করে, তখন তাকে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। তার গতিবিধি সম্পর্কে টাওয়ার থেকে সমালোচনা করা হয়। একটু যদি পাশ ঘেঁষে আসতে থাকে, সাথে সাথেই জানানো হয় তাকে। একটু যদি বেশি ওপর বা নিচ দিয়ে আসতে থাকে, চট করে শুধরে দেয়া হয় তার ভুল। ভদ্রতার খাতিরে চুপ করে থাকে না টাওয়ারের লোকটা। কিন্তু কই, কোন পাইলটকে তো এইসব সমালোচনায় মনঃক্ষুণ্ণ হতে দেখলাম না আজ পর্যন্ত।'

দেখা যাচ্ছে, সব সমালোচনায় ক্ষুণ্ণ হয় না মানুষ। পাইলটের এই দৃষ্টান্তকে একটু বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব সঠিক সমালোচনার প্রায় সবক'টি গুণই এতে বর্তমান। প্রথমেই লক্ষ করা যাচ্ছে, ব্যক্তিগত আত্মপ্রসাদের জন্যে ত্রুটি সংশোধন বা সমালোচনা করছে না টাওয়ারের লোকটি। কোম্পানী, যাত্রী, পাইলট—অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট সবার যাতে মঙ্গল হয় সেই পথটা নির্দেশ করছে। বকা-

ঝাকা দিয়ে পাইলটকে ছোট করা তো হচ্ছেই না, ব্যক্তিকে উহ্য রেখে সমালোচনা করা হচ্ছে তার কাজটাকে। লাউডস্পীকারে প্রচার করা হচ্ছে না এই সমালোচনা—গোপনে এয়ারফোনের মাধ্যমে পাইলটের কানে কানে জানানো হচ্ছে ত্রুটির কথা। পাইলটকে যা করতে বলা হচ্ছে সেটা টাওয়ারে বসা লোকটাকে খুশি করার জন্যে নয়, পাইলটের নিজের স্বার্থ ও মঙ্গলও জড়িত রয়েছে এই নির্দেশের মধ্যে, ত্রুটি সংশোধন করে নিলে পাইলট নিজেও উপকৃত হচ্ছে। ক্ষুণ্ণ হওয়া তো দূরে থাক, ক্ষেত্র বিশেষে চাইনিজ ডিনার খাওয়ার দাওয়াত দিচ্ছে সে সমালোচককে। সবচেয়ে বড় কথা, সমালোচনার মাধ্যমে উভয়ে মিলে একটা কিছু কাজের কাজ সম্পন্ন করছে তারা।

আমরাও যদি সমালোচনার এই রীতি অনুসরণ করি, তাহলে তিক্ততা এড়িয়ে আমরাও কিছু কাজের কাজ সম্পন্ন করতে পারব। সমালোচনার সুফল উপভোগ করতে পারব ক্ষুণ্ণ না হয়ে বা করে।

গোপনীয়তা

সমালোচনার সুফল পেতে চাইলে কক্ষনো কারও 'অহমে'র উপর আক্রমণ চালাবেন না। আপনার উদ্দেশ্য: গড়ে তোলা, কাউকে ছোট করা নয়। আপনার উদ্দেশ্য যদি মহৎও হয়, আপনার মনে রাখতে হবে সমালোচনাটা অপরে ঠিক কিভাবে গ্রহণ করছে, সেটাই আসল কথা। আপনার বক্তব্য যদি উপযুক্ত আলোকে সে গ্রহণই না করতে পারল, তাহলে আপনার উদ্দেশ্যটাই বিফল হয়ে যাচ্ছে। আরও মানুষের উপস্থিতিতে যদি কাউকে নরম করেও কিছু সমালোচনা করেন, সেটা হজম করা তার পক্ষে খুবই শক্ত হবে। যত মঙ্গল-কামনা নিয়েই বলে থাকুন না কেন, সে এটাকে ধরে নেবে অপরের সামনে তাকে ছোট করার ইচ্ছে হিসেবে।

এই নিরিখে আপনি নিজের সত্যিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কেও একটা পরিষ্কার ধারণা করে নিতে পারবেন, যদি চান। নিজেকে প্রশ্ন করুন, অন্যের উপস্থিতিতে কারও দোষ ধরতে আপনি পছন্দ করেন? অতিথিদের সামনে স্বামী, স্ত্রী বা ছেলেমেয়েদের ভদ্রতা, বিনয় বা আচার-আচরণ সম্পর্কে উপদেশ দেন? যদি তাই হয়, বুঝতে হবে আপনার আসল উদ্দেশ্য তাকে সংশোধন বা সাহায্য করা নয়, তাকে ছোট করে আত্মপ্রসাদ লাভ করা। শুধু বড়দেরই নয়, শিশুদের বেলাতেও এই একই কথা। তাদের বন্ধু-বান্ধব বা খেলার সাথীর সামনে ভুলেও সমালোচনা করবেন না।

কাউকে সংশোধন করতে হলে তাকে একা ডেকে আলাদা ভাবে গঠনমূলক সমালোচনা করুন।

প্রশংসা বা সমর্থন

মিষ্টি কথা, প্রশংসা বা সমর্থন মানুষে মানুষে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে তোলে। সমালোচনা করতে হলে এসব দিয়ে শুরু করুন। এর ফলে প্রথমেই আপনি তাকে জানাচ্ছেন তার 'অহম'কে আক্রমণ করা আপনার উদ্দেশ্য নয়। এই একটি ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হলেই কেবল একজনের পক্ষে অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি সঠিকভাবে

অনুধাবন করা সম্ভব। নইলে সে আত্মরক্ষার বর্ম পরে নেবে প্রথমেই, আপনার কোন কথা বুঝতে চাইবে না। কিন্তু প্রথমেই যদি প্রশংসা দিয়ে শুরু করেন, তাহলে সে জানবে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা আপনার উদ্দেশ্য নয়, কাজটা আরও ভাল করে করবার জন্যে আপনি তাকে সাহায্য করতে চান তারই মঙ্গলের জন্যে। আপনার বক্তব্য গোগ্রাসে গিলবে তখন শ্রোতা।

কাজেই প্রথমেই কারও মাথার ওপর বোমা না ফেলে একটু বুদ্ধি খরচ করে তাকে আপনার উপদেশ গ্রহণ করবার মুডে নিয়ে আসুন। নিচের কয়েকটি উদাহরণ এ ব্যাপারে সাহায্য করবে আপনাকে।

'তোমার রিপোর্টটা চমৎকার হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে খুব খেটে তৈরি করেছ। প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টই রয়েছে এতে। শুধু একটা ব্যাপার যোগ করলে আমার মনে হয়…'

'গত দুটো বছর ধরে সুন্দর সুষ্ঠু ভাবে কাজ করে যাচ্ছ তুমি। কাজের প্রতি তোমার এই যত্ন সবার প্রশংসা অর্জন করেছে। আমরা সবাই খুশি। ইদানীং আমার মাথায় আর একটা বুদ্ধি এসেছে। এটা যদি কাজে লাগাতে পারো, আমার মনে হয় আরও ভাল কাজ দেখাতে পারবে তুমি। ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভেবে দেখলে…'

'দেখতে পাচ্ছি, দিন দিন তোমার কাজে উন্নতি হচ্ছে। এতে প্রমাণ হয় তুমি সবসময়েই কাজটা কি করে আরও ভাল করা যায় সেই উপায় খুঁজছ। একটা উপায়ের কথা আমার মাথায় এসেছে, মনে হয় তুমি এ থেকে উপকৃত…'

কাজের সমালোচনা

ব্যক্তিকে সমালোচনা না করে তার কাজ বা ব্যবহারের সমালোচনা করুন। এইভাবে আপনি তার 'অহম'কে পাশ কাটিয়ে যেতে পারবেন। আসলে তার কাজটারই তো আপনি উন্নতি চাইছেন। কাজ বা ব্যবহারের সমালোচনা করেও আপনি তার আত্মপ্রেমের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারেন অনায়াসে।

'শামসু, তোমার তো এরকম ভুল হতে দেখিনি আগে।'

'রহমান, কথাটা বলতে বাধ্য হচ্ছি এই জন্যে যে, আমি জানি চেষ্টা করলেই তুমি আরও অনেক ভাল করতে পারো। আসলে তোমার যোগ্য কাজ হয়নি এটা।'

এর মাধ্যমে আপনি শামসু আর রহমানকে 'তুমি বাজে লোক' না বলে বলছেন 'যা কাজ দেখিয়েছ, আমার বিশ্বাস, এর চেয়ে অনেক ভাল কাজ তোমার দ্বারা সম্ভব।' অর্থাৎ, 'ভুলটা শুধরে নেয়ার ক্ষমতা তোমার আছে।'

আপনি যেহেতু তার কাছ থেকে আরও ভাল কাজ আশা করছেন, তার ক্ষমতায় বিশ্বাস রাখছেন, যা আশা করা হচ্ছে সেইমত কাজ করবার প্রেরণা বোধ করছে সে। যে ভূমিকা দিচ্ছেন সেই ভূমিকায় অভিনয় করবে সে, কারণ মানানসই কাজ করতে সবাই চায়।

সমাধান দিন

কাউকে যখন বলছেন তার ভুল হয়েছে, কি করলে ঠিক হবে সেটা বলে দেয়ার

দায়িত্বও বর্তাচ্ছে আপনারই উপর। ভুলের উপর ততটা জোর না দিয়ে জোর দিতে হবে ভুলটা সংশোধনের উপায়ের উপর, যাতে ভুলের পুনরাবৃত্তি না হয় তার উপর।

কি করতে হবে সেটা বুঝিয়ে না দিয়ে কেবল ত্রুটি ধরলে কোন লাভ হয় না। যে ভুল করছে সে জানে না বলেই ভুল করছে, তাকে জানাতে হবে সঠিক পথ। তা না করে শুধু অসন্তোষ প্রকাশ করলে বা বকাঝকা করলে ঘাবড়ে গিয়ে অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়বে অধস্তন কর্মচারী। টার্গেট জানা নেই বলে ছুঁড়বে যেদিক সেদিক। তার এক আধটা আপনার চোখে এসে লাগাও বিচিত্র নয়।

আদেশ নয়, অনুরোধ

যখনই কাউকে কোন আদেশ দিচ্ছেন, তাকে ভৃত্যের ভূমিকায় নামিয়ে দিচ্ছেন···আপনি বস্। যখন অনুরোধ করছেন, সে হয়ে দাঁড়াচ্ছে টীম মেম্বার, আপনার সহকর্মী। কি রকম ব্যবহার করছেন আপনি অনেকটা তারই উপর নির্ভর করবে মানুষের সহযোগিতার পরিমাণ। আদেশ মাত্রেই বিদ্রোহের সৃষ্টি করে মানুষের অবচেতন মনে। কিন্তু কাজটা যদি একটা টীম-ওয়ার্ক হিসাবে ধরেন, যেন একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টা করছেন আপনারা সবাই মিলে, আপনার সংশোধন সহজ মনে মেনে নেবে সহযোগী—কারণ এখানে নিজেকে বড় প্রমাণ করবার জন্যে আপনি ত্রুটি ধরছেন না, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোই আসল কথা।

একবারে একটি

অতীত টানতে যাবেন না। বর্তমানে যে ভুলটা হয়েছে কেবল তারই উল্লেখ করুন। মনে রাখতে হবে: সমালোচনার অর্থ 'অহমযুদ্ধ' নয়, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার সঠিক পথনির্দেশ। অতীতে কবে সে কি ভুল করেছিল সেসব সাত হাত মাটির নিচে কবর দিয়ে দেয়া উচিত। এটা কেবল উর্ধ্ব বা অধস্তন কর্মচারীর বেলাতেই নয়, পারিবারিক সম্পর্ক, অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী-সন্তান ও আত্মীয়দের বেলাতেও একই ভাবে প্রযোজ্য। পুরানো কথা টানতে যাবেন না। নালিশ জানাতে হলেও জানান একবারে একটি।

এই প্রসঙ্গে অনেক দিন আগের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে।

আমার এক ভাগনী, সাত বছরের মিলি, গম্ভীর থমথমে মুখ নিয়ে ফিরেছে স্কুল থেকে।

'কি হয়েছে, মা মণি?' জিজ্ঞেস করলেন আমার বোন। 'টিচার বকেছে তোমাকে?'

'না। রিকশাওয়ালা আমাকে "তুই" বলেছে।'

'তাই নাকি? ভারি শয়তান তো। মস্ত বাড় বেড়ে গেছে ওর। দাঁড়াও ওর মজা দেখাচ্ছি আমি।'

সহানুভূতি পেয়ে আরও কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল মিলি। সব দুঃখ উথলে উঠেছে ওর ছোট্ট বুকে। 'আর···পরশু আব্বা বকেছিল।'

'কী সর্বনাশ! আমার সোনামণিকে বকা! আসুক তোমার বাপ, ওর বারোটা

বাজিয়ে ছাড়ব আমি আজ। এত বড় সাহস, আমার আম্মুকে বকে!'

ইতিমধ্যে ফোঁপাতে শুরু করেছে মিলি। 'আর…আর… সেদিন আপনি মে-রে-ছি-লে-ন।' বলেই ভ্যাঁ।

ঠিক কোন্ ব্যাপারটার জন্যে যে সহানুভূতি চাইছে বোঝা মুশকিল। তাই না? বুকের মধ্যে নালিশ পুষে রাখার মতই কারও অতীত ভুলের জন্যে যদি বিক্ষোভ পুষে রাখেন, শুধু হাস্যাস্পদই নয়, ইন-এফেকটিভ হয়ে পড়বেন। উল্টোফল হবে।

একবারে একটি ত্রুটি তুলে ধরুন।

হাসিমুখে বিদায়

কোন ব্যাপার ঝুলিয়ে রাখবেন না। সমালোচনা করা বা ত্রুটি সংশোধনের উপায় দেখিয়ে দেয়া হয়ে গেল, ব্যস, হাসি খুশি পরিবেশে সমাপ্তি টানুন, চুকিয়ে দিন ও পাট। বিদায় নেয়ার সময় জ্বালা নিয়ে নয়, যেন আশ্বাস, ভরসা ও উৎসাহ নিয়ে যেতে পারে সমালোচিত ব্যক্তি।

কাঁধে মৃদু চাপ দিয়ে বলুন: 'আমি জানি, পারবে তুমি।'

মৃদু হেসে বলুন: 'হয়ে যাবে, একটু চেষ্টা করো—সব ঠিক হয়ে যাবে।'

সব ভাল যার শেষ ভাল।

পরিশেষ

বইটির শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা। এইবার আমার সাথে এ কাজে নামতে হবে আপনাকেও। আসুন, দেখা যাক লোক-সম্পর্ক উন্নয়নের ব্যাপারে এই বইটি কিভাবে আপনার উপকারে আসতে পারে। শুধু যদি বলেন, 'ঠিক আছে, চমৎকার সব তত্ত্ব, জ্ঞান আর উপদেশ পেলাম এই বইটি থেকে, চেষ্টা করব কথাগুলো মনে রাখতে'—তাহলে মস্ত ভুল হবে। উড়ু উড়ু ভাবে কিছুই হয় না। নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে নিয়ে কাজে নামতে হবে আপনার।

এ-বই থেকে কোন উপকার পাওয়া বা না পাওয়া এখন সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে আপনার নিজের উপর। হাজার হাজার মানুষ যে-সব তথ্য ও জ্ঞান কাজে লাগিয়ে উপকৃত হয়েছে, সে রকম অসংখ্য পরীক্ষিত ও প্রমাণিত সত্য তুলে ধরা হয়েছে এই বইয়ে। মানব চরিত্রের মৌলিক উপাদান সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। এইসব ধারণা বা জ্ঞান সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জনের পূর্বশর্ত, সন্দেহ নেই, কিন্তু এগুলোই সব নয়। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে: প্রয়োগ। জ্ঞানের সাথে প্রয়োগ যুক্ত না হলে সাফল্য আসতে পারে না। সফল হতে হলে নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে হবে আপনার লব্ধ জ্ঞান।

বইটির গোড়ার দিকে একটা বলপেন কাছে রাখতে অনুরোধ করেছিলাম, মনে আছে? কোথায় সেটা? দাগ দেয়ার অনুরোধ করেছিলাম, দিয়েছেন? কেন এই অনুরোধ করছি জানাব বলেছিলাম বইয়ের শেষে। বই শেষ হয়ে এল—বলছি, শুনুন।

লক্ষ্যস্থির

ঠিক জায়গামত গুলি লাগাতে হলে লক্ষ্য স্থির করতে হবে আপনাকে।

আত্মোন্নয়নমূলক বই পড়ে বেশিরভাগ মানুষই বিশেষ কোন উপকার পায় না। তার প্রধান কারণ হচ্ছে এসব বইয়ের মাধ্যমে নিজের দিগন্তবিস্তৃত সম্ভাবনার কথা জানতে পেরেই খুশিতে ডগমগ হয়ে যায় মানুষ, মুগ্ধ হয়ে যায় নিজের অন্তর্নিহিত গুণের কথা জানতে পেরে। ব্যস, ওই পর্যন্তই। হাতে কলমে কাজে নামতে চায় না কেউ। এইসব তথ্য কিভাবে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে কোন্ কোন্ বিশেষ ক্ষেত্রে নিজেকে উন্নততর করে নিতে হবে, সেসব নিয়ে কাজ করা তো দূরে থাকুক ভাবতেই চায় না মানুষ। কেন ভাবতে চায় না? আসলে লাইন পায় না। ভাবনারও তো একটা লাইন দরকার—একটা নির্দিষ্ট পথ থাকা দরকার। সেই পথের নির্দেশ দিতে চাই আমি এখানে।

এ বইয়ে যেসব জ্ঞানের কথা রয়েছে সেসব আপনার কোনই কাজে আসবে না, যদি না নিজের ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে এসবকে বাস্তবে কাজে লাগান। কিভাবে সেটা সম্ভব? প্রথমে নিজের সমস্যাগুলোকে চিনতে

হবে। লিখে ফেলতে হবে। সাজিয়ে নিতে হবে এক-দুই করে। ফলিত মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন যে কোন সমস্যা লিখে ফেললে সমাধানের পথ বেরিয়ে আসে সহজে। আমাদের আসল সমস্যা হচ্ছে সমস্যাকে পরিষ্কার ভাবে চিহ্নিত করা। কি চাই সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারলে কিভাবে কোন্ পথে এগোলে তা পাওয়া যাবে বুঝতে সহজ হয়, সেই মত নিজেকে পরিবর্তন করে নেয়াও কঠিন হয় না।

কাজেই এই বইয়ের মাধ্যমে যা জানা গেল সেটাকে বাষ্প হয়ে উড়ে যেতে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আসুন গেঁথে ফেলা যাক। লিখে ফেলা যাক সমস্যাগুলোকে।

আপনার বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই নেই। আপনার সমস্যা বুঝতে হবে আপনার নিজেকেই। আমি শুধু জানি জীবনের তিনটে ক্ষেত্রে বেশির ভাগ মানুষেরই কিছু না কিছু সমস্যা থাকে: পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন ও কর্মজীবন। সমস্যাগুলো বুঝে নেয়ার জন্যে আপনার নিজেকে একটু বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। নিজেকে বিশ্লেষণ করবার সুবিধের জন্যে কয়েকটা প্রশ্ন সাজিয়ে দিচ্ছি আমি। এগুলোর সঠিক উত্তর লিখুন নিচের খালি জায়গায়। সততার সাথে ফর্মটা পূরণ করলেই নিজের সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবেন আপনি। পরিষ্কার বুঝতে পারবেন কোন্ ত্রুটি দূর করতে হবে প্রথমে, কোন্‌টা তারপর। বুঝে নিয়ে সেইমত কাজ করে যান। যেসব ত্রুটি বা দুর্বলতা আপনাকে পিছনে টেনে রাখছে, এগোতে দিচ্ছে না সামনের দিকে উন্নতির পথে, সেসবের নাগপাশ কেটে মুক্ত করে নিন আপনার নিজেকে। এই বইয়ের যেসব কথা আপনার গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে, যেসব লাইনের নিচে দাগ দিয়েছেন, দেখবেন আপনার বন্ধন মুক্তির কাজে সেসব কথা অত্যন্ত কাজে লাগবে এখন। সমাধানের ইঙ্গিত পাবেন সেই সব বক্তব্যের মধ্যে থেকে।

এ বইটা যখন লিখতে শুরু করি একটাই উদ্দেশ্য আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে—যেহেতু আমি জানি আপনার সুখ ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে আপনি মানুষের সাথে কি রকম সম্পর্ক স্থাপন করছেন তার উপর, আমি চেয়েছি বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণার ফসল আপনার হাতে তুলে দিয়ে লোক-সম্পর্ক উন্নয়নে আপনাকে সাহায্য করতে। আমার এই উদ্দেশ্য সফল করতে হলে এবার আপনার কিছুটা সহযোগিতা দরকার। আপনার সক্রিয় সহযোগিতা না পেলে এ বই লেখার উদ্দেশ্যটাই আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে সম্পূর্ণ ভাবে। আপনি যদি এ বই থেকে উপকৃত না হন, আপনার জীবনটা যদি আরও সুখী, আরও সফল হয়ে না ওঠে, তাহলে আমার সমস্ত শ্রম পণ্ডশ্রমে পরিণত হবে। রয়্যালটির লোভে আমি এ বই লিখিনি—কথাটা নিশ্চিন্ত মনে বিশ্বাস করতে পারেন। এ বইয়ের বিষয়বস্তু আমার ভাল লাগে, সেই কারণে অনেক অনেক বই ঘেঁটেছি। যেসব তথ্য আহরণ করেছি সেগুলো আপনার কাজে লাগবে সেই আশায় হাত দিয়েছি লেখায়। বইটি কিনতে আপনার যত টাকা ব্যয় হয়েছে, সেই টাকা থেকে শতকরা সাত ভাগ পাব আমি, এবং সানন্দে গ্রহণ করব। কিন্তু এই পাওয়াই আমার সব পাওয়া নয়। আমি যখন জানতে পারব আমার এই লেখা থেকে আপনি উপকৃত হয়েছেন, আমার লেখা

সাহায্য করেছে আপনাকে সুখী ও সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠতে—তখন যে অনাবিল আনন্দে আমার বুকটা ভরে যাবে, সেটাই হবে আমার আসল পাওয়া।

কাজেই আপনার প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ: দয়া করে অসম্পূর্ণ রাখবেন না বইটি—আজই পূরণ করে ফেলুন নিচের ফর্ম।

আত্মবিশ্লেষণ

১। আমি কি মানব চরিত্রের দোষ ত্রুটিই দেখতে পাই বেশি করে? কোন কাজে কারও সাহায্য না পেলে দোষটা কি আমি তাকেই দিই?

২। সবার কাছ থেকেই নিখুঁত কাজ ও ব্যবহার আশা করি আমি? নাকি সে যেমন তাকে দোষগুণসহ তেমনি ভাবেই মেনে নিতে পারি? আমার সংস্পর্শে এসে মানুষ কি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে?

৩। কারও কাছে যখন কিছু চাই, আমি কি বিনিময়ে তাকেও কিছু দিতে প্রস্তুত থাকি? আমার চাহিদা আদায় করতে গিয়ে তার চাহিদার প্রতিও নজর রাখি?

৪। সবাই তার আত্মপ্রেমের মাত্রা বাড়িয়ে তুলতে চায়। আমি কি সুকৃতির মাধ্যমে আমার আত্মপ্রেম বাড়াতে চাই, নাকি চেষ্টা করি মানুষকে ছোট করে নিজেকে বড় প্রমাণ করতে?

৫। অন্য মানুষ ও তার সমস্যার ব্যাপারে আমি কি সত্যিই আন্তরিকভাবে আগ্রহী?

৬। আমি কি মানুষকে যথেষ্ট মনোযোগের সাথে লক্ষ করি? নাকি ভাসা ভাসা?

৭। আমি কি সব মানুষকে সমমর্যাদার ভিত্তিতে গ্রহণ করি? নাকি সামান্য হলেও কিছুটা মাতব্বরির ভাব থেকে যায় আমার ব্যবহারে? 'বসিং' করতে চাই?

৮। নিজেকে আরও বেশি করে পছন্দ করবার ব্যাপারে আমি কি মানুষকে সাহায্য করি, নাকি তাকে ফাটা বেলুনের মত চুপসে দিয়ে, তাকে ছোট করে আনন্দ পাই?

৯। অপরের ব্যক্তিত্ব ও বিশেষত্বকে কি আমি যথেষ্ট পরিমাণে সম্মান করি?

১০। আমার কথায়, কাজে ও ব্যবহারে কি মানুষের প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে সম্মান প্রকাশ পায়? আমার উপস্থিতিতে সে কি নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ বলে

ভাবতে পারে?

১১। বন্ধুসুলভ আচরণ করবে ধরে নিয়েই কি আমি মানুষের সাথে মিশতে পারি? অপর পক্ষ থেকে সাড়া পাওয়ার অপেক্ষায় না থেকে আমি কি যেচে আলাপ করতে পারি মানুষের সাথে?

১২। আমি কি আমার চেহারা ও বেশ-ভূষার ব্যাপারে যত্নবান? জুতোজোড়া পালিশ করাই নিয়মিত? নিয়মিত চুল ছাঁটাই। পরিষ্কার ইস্তিরি করা কাপড় পরি? নিয়মিত নখ কাটি?

১৩। মানুষের কাছ থেকে আমি যে ব্যবহার আশা করি আমি কি তাদের সাথে ঠিক সেই রকম ব্যবহার করি?

১৪। আমি কি ভাল কথা বলতে পারি? আলাপী লোক?

১৫। কেউ কথা বললে আমি কি মন দিয়ে তার কথা শুনি? মুখের চেয়ে কানের ব্যবহার দ্বিগুণ করি?

১৬। কাউকে কিছু বুঝিয়ে স্বমতে আনার ব্যাপারে কি আমি যথেষ্ট পারদর্শী?

১৭। মানুষের সহযোগিতা কি আমি সহজেই আদায় করতে পারি?

১৮। প্রশংসার জাদু কিভাবে কাজে লাগাতে হয়, জানা আছে আমার? গত সাতদিনে কয়জনকে প্রশংসা করেছি, কিসের জন্যে?

১৯। অপরের প্রাপ্য মর্যাদা, প্রশংসা ও স্বীকৃতি কি আমি সবসময়ই দিয়ে থাকি?

২০। আমি কি ধন্যবাদের মাধ্যমে যথেষ্ট পরিমাণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অভ্যস্ত?

২১। অপরের মনে আঘাত না দিয়েও কি করে তার কোন কাজের সমালোচনা করা যায় আমি জানি?

২২। মানুষের সাথে চলনে, বলনে, আচারে, ব্যবহারে আমি কি সত্যিই সৎ?

২৩। আমার ব্যবহারে কি কখনও অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পায়?

২৪। কারও কাছে কোন সাহায্য চাইবার আগে কি আমি সবসময় তাকে কি দিচ্ছি ভেবে দেখি? কাজটা করলে কিভাবে তার আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি হতে পারে ভালো বুঝে নিই?

২৫। কারও বিরুদ্ধে রাগ বা অভিযোগ কি পুষে রাখি মনের মধ্যে?

২৬। মেজাজ ঠিক রাখতে পারি? মানুষের সামনে রাগ চাপতে না পেরে গোলমালে জড়িয়ে পড়ি?

২৭। নিজের ভীতি চেপে রাখতে গিয়ে কখনও বেয়াড়া রকমের গর্ব কিংবা হামবড়াই ভাব প্রকাশ করে ফেলি?

২৮। আমার ব্যবহারে ঔদ্ধত্য বা নাক-উঁচু ভাব প্রকাশ পায়?

গুছিয়ে নেয়া

এবার গুছিয়ে নিতে হবে আমার ত্রুটিগুলো।

যেসব বিষয়ে আমার নিজেকে কিছুটা পরিবর্তন করতে হবে সেগুলো তালিকা নম্বর হচ্ছে…

সব ত্রুটি একসাথে সংশোধন করা সম্ভব নয়। একটা একটা করে পথের কাঁটা দূর করতে হবে আমাকে। কাজেই আত্মোন্নয়ন করতে গিয়ে বেশি জরুরী বিষয়গুলোকে আগে এবং কম জরুরী বিষয়গুলোকে পরে—এইভাবে প্রাধান্যের তারতম্য অনুসারে সাজিয়ে নিচ্ছি।

আমার প্রথম কাজ: তালিকা নম্বর…। এই ব্যাপারে আমার কাজে লাগবে এই বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা…, …, …, …।

আমার দ্বিতীয় কাজ: তালিকা নম্বর…। এই ব্যাপারে আমার কাজে লাগবে এই বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা…, …, …, …।

আমার তৃতীয় কাজ: তালিকা নম্বর…। এই ব্যাপারে আমার কাজে লাগবে এই বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা…, …, …, …।

প্রথম কাজটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে আমার পারিবারিক, সামাজিক ও কর্মজীবনে কি কি পরিবর্তন আনতে হবে, অর্থাৎ ঠিক কি কি করতে যাচ্ছি আমি সেটা লিখে নিচ্ছি নিচে।

উন্নতি হচ্ছে কিনা যাচাই করে দেখবার তারিখ।

……………………………………………(এক সপ্তাহ পরের তারিখ)

পরীক্ষার ফলাফল ( ) ভাল, তবে আরও সময় লাগবে।

( ) ভাল নয়, কৌশল পরিবর্তন করা দরকার।

গত সপ্তাহের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে আগামীতে ঠিক কি করতে যাচ্ছি সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি:

শেষ অনুরোধ

আত্মজীবনীর এক জায়গায় বেনজামিন ফ্র্যাংকলিন লিখেছেন নিজের দোষত্রুটি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা সত্ত্বেও কিভাবে বছরের পর বছর কেটে গেছে তাঁর, শুধরে নিতে পারেননি একটি ত্রুটিও। শেষে একদিন কাগজ কলম নিয়ে একটি তালিকা তৈরি করে নিলেন তিনি ত্রুটিগুলোর। যেমন, বদ মেজাজ, অসহিষ্ণুতা, অপরের জন্যে সহানুভূতির অভাব, ইত্যাদি লিখে ফেললেন তিনি। তারপর এক, দুই করে সাজালেন সেগুলোকে। স্থির করে নিলেন কোন্ ত্রুটি আগে শুধরানো দরকার, কোন্‌টা পরে। এইভাবে সাজিয়ে নিয়ে এক এক করে কাটিয়ে উঠতে শুরু করলেন তিনি নিজের দুর্বলতাগুলো। এক বছরের মধ্যেই বেশির ভাগ দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে জীবনটা সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে তুলতে পেরেছিলেন তিনি।

আপনাকেও তেমনি সব ত্রুটি একসাথে শুধরে নেবার কথা না ভেবে এক এক করে কাটিয়ে উঠতে হবে দুর্বলতা। মনে রাখবেন, মানুষ মাত্রেরই ত্রুটি বা দুর্বলতা আছে—আপনি ব্যতিক্রম নন। নিজের ত্রুটি ধরতে হবে আপনার নিজেকেই। এবং শুধরে নিতেও হবে নিজেকে। ত্রুটি বা দুর্বলতা মানুষকে টেনে রেখে দেয় পিছনে—এগোতে দেয় না।

অসম্পূর্ণ অবস্থায় বইটা আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি আমি। দয়া করে বইটি শেষ করুন—অসমাপ্ত অবস্থায় ফেলে রাখবেন না এটাকে। বইটি যদি সযত্নে আপনার বুক-শেলফে তোলা থাকে, এই বইয়ের প্রতিটি তত্ত্ব যদি আপনার সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে সহায়ক না হয়, বাস্তব জীবনে যদি এসব কাজে লাগিয়ে উপকৃত হতে না পারেন, তাহলে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে আমার সমস্ত প্রচেষ্টা।

আমার শেষ অনুরোধ: দয়া করে বইটি অসমাপ্ত রাখবেন না, আজই নেমে পড়ুন কাজে।

আপনার জয়যাত্রাপথে রইল আমার শুভেচ্ছা।

সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধিতে কানায় কানায় ভরে উঠুক আপনার ভবিষ্যৎ জীবন।

* * * *